সূচীপত্র।

তৃতীয় ভাগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোগল রাজাদের রাজত্ব।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

তৃতীয় ভাগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোগল রাজাদিগের রাজ্যারম্ভ।

বাবর।

যে মোগল দিগের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষ অতি উন্নত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বাবর তাঁহাদিগের আদি পুরুষ। বাবর বাল্য কালাবধি কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই কাল যাপন করিয়াছিলেন, এক দিনের নিমিত্তেও সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। পরন্তু, তাঁহার সকল সময় একপ্রকার যায় নাই। তিনি কখন রাজসিংহাসনে বিরাজ করিয়াছিলেন, কখন বা অতি দীনের ন্যায় পর্ব্বত ও কাননে কাল যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

পাঠকেরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন বাবর বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গের বংশোদ্ভব। তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সাহরোখ তদুপার্জ্জিত বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার উত্তরাধি-

কারিগণ তাদৃক্ বীর্য্যবান্ ছিলেন না, ইহাতে ঐ রাজ্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস দশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। পরে ঐ তৈমুর লঙ্গের বংশোদ্ভব আবু সৈয়দ রাজা হইয়া ঐ রাজ্য আপন পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, বিভাগানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহম্মদ মির্জা সমরকন্দ ও বোখারা রাজ্য, দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ মির্জা বাখ রাজ্য, তৃতীয় পুত্র অলকবেগ কাবুল রাজ্য, এবং চতুর্থ পুত্র ওমার সেখ মির্জা ফরগণা রাজ্য প্রাপ্ত হন। ওমার সেখ মির্জা, বাবরের পিতা। রাজ্য প্রাপ্তির পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ওমার সেখের ভাবান্তর হইয়া ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধ শেষ না হইতে

হিঃ ৯০০
খৃঃ ১৪৯৪
কঃ ৪৫৯৫

হইতে ওমার সেখ পরলোক গমন করি-লেন। তখন বাবরের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

বাবর এই নবীন বয়সে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠতাতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু হইল, তাহাতে তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত মহম্মদ মির্জা, সমরকন্দ অধিকার করিয়া সেই যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনিও কিছু দিন পরে কালগ্রাসে পতিত হইলেন, তাহাতে সমরকন্দ রাজ্য একেবারে প্রভুহীন ও বিশৃঙ্খল হইল। বাবর তাহা দেখিয়া ঐ রাজ্য অধিকারের বাসনা করিলেন, এবং যদিও তিনি দুই তিন বার যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, কিন্তু অবশেষে

খ্রি° ১৪৯৭ }
পূ ১৪৯১ }

সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া সমরকন্দের রাজা হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। ইহাতেই তাঁহার বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে, কিন্তু তাঁহার যাদৃশ সাহস ও আকাঙ্ক্ষা, তাদৃশ বল ও উপায় ছিলনা। এক দিক রক্ষা করিতে অন্য দিক হস্তান্তরিত হইত। সুতরাং সমরকন্দ জয় করিয়া এক শত দিবস রাজত্ব করিয়াছেন কিনা, এমন সময়ে জঙ্গল নামে তাঁহার এক সেনাপতি তাঁহার নিজ রাজ্য ফরগণা অধিকার করিলেন।

এই সংবাদে তিনি সমরকন্দে কাল বিলম্ব না করিয়া ফরগণাতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার এমন উৎকট পীড়া হইল যে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। যদিও এই পীড়া হইতে কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তিনি শুনিলেন সমরকন্দ-বাসীরা তাঁহার আগমনের পর ঐ রাজ্য শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছে। এবম্প্রকারে বাবর, ফরগণা ও সমরকন্দ উভয় রাজ্য হারাইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন, কিন্তু ইহাতেও একেবারে ভগ্নোদ্যম না হইয়া কিছুকাল মাতুলালয়ে থাকিলেন।

খ্রিঃ ১৪৯৯ }
পূ ১৪৯৯ }

পরে ঐ মাতুলের সাহায্যে ফরগণা রাজ্য পুনরধিকার করিলেন।

তদনন্তর সমরকন্দ বাসীরা বাবরকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিল আপনি এইখানে আসিবেন, আমরা আপনাকে

এই রাজ্য দেওয়াইব। বাবর এই পত্র পাইয়া সমরকন্দ যাত্রা করিলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত না হইতে হইতে শুনিলেন যে উজবক জাতীয়েরা সমরকন্দ ও বোখারা উভয় রাজ্য হরণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব সেনাপতি তম্বল পুনর্ব্বার ফরগণা অধিকার করিলেন; বাবর কি করেন, দুই কুল হারাইয়া স্বীয় রাজ্যের দক্ষিণাংশে শৈলশিখরে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে উজবকদিগের সেনাপতি সিবানী খাঁ যুদ্ধার্থ স্থানান্তর গমন করিল। এই সংবাদে বাবর ২৪০ জন লোক সমভিব্যাহারে সমরকন্দ যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া রজনীযোগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নগর প্রবেশ করিয়া প্রহরীদিগকে অবিশ্রান্ত সংহার করিতে লাগিলেন। এই কাণ্ড দেখিয়া নগররক্ষক ও নগরস্থ প্রজাগণের বোধ হইল তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছে, অতএব তাহারা যুদ্ধাদি না করিয়া তাঁহারই পক্ষ হইল। বাবর তাহাতে অনায়াসে ঐ নগর অধিকার করিলেন। সুতরাং উজবকেরা নগর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকিল। বাবর ঐ স্থান হইতেও তাহাদিগকে দূর করিবেন এই মানসে যুদ্ধসজ্জা করিয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু সংগ্রাম সময়ে তাঁহার সেনাগণ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রতিপক্ষদিগের রণ-ভাণ্ডার লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে সমরে অসমর্থ হইয়া তিনি প্রাণ রক্ষার্থে সমরকন্দে আসিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহার পশ্চাৎ২

আসিয়া ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া থাকিল। বাবর শত্রু-জালে বেষ্টিত হইয়াও চারি মাস পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে থাকিলেন। তাহার পর আহারাভাবে তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

তদবধি তিনি দুই বৎসর পর্য্যন্ত অতি ক্লেশে কাল যাপন করিলেন। এই ক্লেশ ক্রমশঃ অসহ্য হইল, কাজেকাজেই তিনি মনে মনে স্থির করিলেন চীন রাজ্যে যাইয়া কোন প্রকারে দীনবেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। কিন্তু হঠাৎ তাহা না করিয়া আশার দাস হইয়া আর কিছু কাল প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিলেন। ইতিমধ্যে ফরগনা রাজ্যে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তখন তিনি মাতুলের সহায়তায় ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে তাঁহার প্রাচীন শত্রু তম্বল উজবক-দিগের সহিত যোগ করিয়া ফরগনা রাজ্য বেষ্টন করিলেন। বাবর রাজধানীতে থাকিয়া প্রথমতঃ অতি সাহসে যুদ্ধ করিলেন, অবশেষে পরাভূত হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য তথা হইতে পলায়ন করিলেন। দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত তাঁহার অশ্ব ক্লান্ত হইয়া চলিতে পারিল না, সুতরাং তিনি পলায়নে অসমর্থ হইয়া শত্রুহস্তে পতিত হইলেন।

কিছু কাল পরে তিনি কৌশলক্রমে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলেন, কিন্তু তৎকালে উজবকদিগের প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, এবং তাহারা অলকনন্দার তীরস্থ তাবদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। বাবর তাহাদের হস্ত হইতে ঐ

দেশ উদ্ধার করিবেন এমন কোন উপায় দেখিলেন না, অতএব ফরগণা রাজ্যের মায়া অগত্যা পরিত্যাগ করিয়া বক্ত্রিয়াতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার সমভিব্যাহারে কেবল তিন শত লোক ছিল, এবং দুইটী মাত্র বস্ত্রাবাস ছিল, তাহার একটীতে আপনি আর একটীতে তাঁহার গর্ব্ভধারিণী থাকিতেন।

বাবর এই ভাবে বক্ত্রিয়া দেশে উপস্থিত হইলে তদ্দেশস্থ লোকেরা তাঁহার সৌজন্যে বশীভূত হইল, এবং অনেকে তাঁহার সহিত যুদ্ধগমনে প্রস্তুত হইল। বাবর এই সকল লোক সমভিব্যাহারে কাবুলে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে কাবুলে মহা উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ইতিপূর্ব্বে তথাকার রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎসভাসদগণ তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনারা রাজ্যাশায় নানা প্রকার বিরোধারম্ভ করিয়াছিলেন। এই বিরোধ বাবরের পক্ষে অতি এঙ্গলকর হইল। তিনি বিদ্রোহী সভাসদগণকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া আপনি তথাকার রাজা হইলেন। এই সময়ে বাবরের বয়ঃক্রম ২৩ বৎসরের অধিক নহে। তদবধি তিনি ক্রমাগত দ্বাবিংশ বৎসর, এবং তাঁহার বংশীয়েরা দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত, তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

খৃ ১৫০৪

কাবুল অধিকারের পর বাবর, তাঁহার প্রাচীন শত্রু উজবক জাতি ও আফগানস্থানের পর্ব্বতবাসী, এবং

তৈমুর বংশীয় স্বীয় কুটুম্ব গণের সহিত অনেক দিন যুদ্ধ করিলেন। মধ্যে তিনি বোখারা ও সমরকন্দ রাজ্য পুনরধিকার করিয়া, পারসস্থানের রাজার সহায়তায়, দুই বৎসর পর্য্যন্ত, ঐ দুই রাজ্য আপন অধিকারে রাখিলেন, কিন্তু পরে উজবকেরা তাঁহাকে তথা হইতে দূরীকৃত করিল। তদবধি তিনি পশ্চিম রাজ্যের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ জয়ের অভিলাষ করিতে লাগিলেন। ঐ অভিলাষ যে প্রকারে সিদ্ধ হইল তাহা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। তিনি, হিজরী ৯৩২ অব্দে,

খৃ ১৫২৬, এপ্রেল
শকাঃ ১৪২৮, বৈশাখ

পানিপতে এব্রাহেমকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন।

বাবর দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়াই যে সমস্ত দিল্লী রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এমন বলা যায় না, তিনি কেবল দিল্লীর পশ্চিম উত্তর আগ্রা পর্য্যন্ত যমুনার তীরস্থ যে ভূখণ্ড দিল্লীর অধীন ছিল তাহাই পাইলেন। গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ যে সকল দেশ দিল্লীরাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা পাইলেন না। এব্রাহেম সাহের রাজত্ব-কালে দরিয়া খাঁ লোহানী নামে এক ব্যক্তি ঐ সকল দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র, মহম্মদ সাহ লোহানী উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক, ঐ প্রদেশের রাজা হয়েন। তিনি বেহার রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যমুনার পশ্চিমে অনেক প্রদেশ হস্তান্তরিত হইয়াছিল, পাঠানেরা এই সকল দেশ অধিকার করিয়াছিল।

এই সকল স্থান অপরের হস্তে থাকিলে রাজ্যের স্বচ্ছন্দ হয় না ইহা বিবেচনা করিয়া বাবর প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহাও অধিকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার সেনাগণ শীতপ্রধান দেশে বাস করিত, ভারতবর্ষের প্রখর রৌদ্র তাহাদিগের অসহ্য হইল। অতএব গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে তাহারা সকলে স্বদেশে যাইবার বাঞ্ছা করিল, কোনরূপে এ দেশে থাকিতে চাহিল না। সৈন্যগণ প্রতিগমন করিলে বাবরের সকল আশা ব্যর্থ হয়, যেহেতু এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সেনাগণ তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বাধ্য হয় নাই। অতএব সকল সেনাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিলেন, দেখ ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য আমরা কত দূর হইতে আসিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হয় নাই, কেবল সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে, যদি এখন আমরা এখান হইতে প্রস্থান করি তাহা হইলে আমাদের সকল পরিশ্রম বৃথা হয়, এবং লজ্জা রাখিতে স্থান পাইব না। অতএব এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করা কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি তোমরা স্বদেশ গমনে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া থাক, যাও, আমি নিষেধ করিব না। কিন্তু আমি যাইব না, আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহার অন্যথা হইবে না।

বাবরকে এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহার অধিকাংশ সেনাগণ তাঁহার সঙ্গে রহিল, অল্পাংশ স্বদেশ গমন করিল। বাবর এই সকল সৈন্য স্থানে স্থানে পাঠা-

ইলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হোমায়ুন তাহাদিগের অধ্যক্ষ হইলেন। এবম্প্রকারে বাবর চারি মাসের মধ্যে, এব্রাহেম রাজার রাজত্বকালে যে সকল স্থান দিল্লীর অধীন ছিল তাহা পুনরধিকার করিলেন। তদ্ভিন্ন জুয়ানপুর প্রভৃতি লোদী গোষ্ঠীর রাজাদিগের রাজত্বকালে যে সকল রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাহাও হস্তগত হইল। অবশেষে বায়েনা, ধলপুর, ও গোয়ালিয়র দেশ তাঁহার অধিকারস্থ হইল।

এই প্রকার মুসলমান রাজারা বশীভূত হইলে পর বাবর হিন্দু রাজাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিলেন।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে খিলজী বংশীয় আলাউদ্দীন রাজার রাজত্বকালে হমির সিংহ চিতোর রাজ্য পুনর্জ্জয় করেন। ঐ রাজপুত ভূপতি ক্রমে সকল মিবার দেশ আপনার অধীন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র আজমির প্রদেশ ঐ রাজ্যভুক্ত করেন। এই দেশে সম্প্রতি যিনি রাজা ছিলেন তাঁহার নাম সঙ্গা। তিনি মালব প্রদেশের পূর্ব্বাংশে ভিলসা ও চন্দেরী পর্য্যন্ত আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এবং মারওয়ার জয়পুর প্রভৃতির তাবৎ রাজপুত রাজারা তাঁহাকে আপনাদের প্রধান বলিয়া মান্য করিতেন। দিল্লী রাজ্যের প্রতি সঙ্গার অত্যন্ত দ্বেষ ছিল, তিনি সর্ব্বদা ঐ রাজ্যের বিনাশ বাঞ্ছা করিতেন। বাবর ঐ রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহার সহিত মৈত্র্যাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বাবর ঐ

রাজ্য জয় করিলেন, তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এই যুদ্ধে অনেক হিন্দু রাজা সঙ্গার সাহায্যকারী হইলেন। এবং মহম্মদ নামে লোদী রাজবংশীয় এক রাজপুত্র, রাজ্যবিহীন হইয়াও, রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক, দশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। তদ্ভিন্ন লোদী বংশীয় প্রধানেরা ও মেওয়াতের রাজা হাসন খাঁ তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

এই সকল দল বল লইয়া সঙ্গা মহা সমারোহ পূর্ব্বক বাবরের সঙ্গে যুদ্ধার্থ সিকরী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। বাবর তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র, হিন্দু সেনাগণ তাঁহার অগ্রগামী রক্ষক সেনাদিগকে কাটিয়া লণ্ড ভণ্ড করিল। যদি ঐ সময় তাহারা আরো কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ করিত, তাহা হইলে তখনি অনায়াসে রণজয়ী হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া তখন যুদ্ধে বিশ্রাম দিল। তাহাতে বাবর সময় পাইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে এক উচ্চ স্থানে রাখিলেন, এবং ঐ স্থানের চতুর্দ্দিক গড়বন্দী করিলেন।

বাবরের সেনাগণ প্রথম উদ্যমে পরাজিত হইয়া এক প্রকার হতোদ্যম হইল। তৎপরে কাবুল হইতে এক বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা বাবরের সভাতে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল এ যাত্রায় তিনি কোন প্রকারে জয় লাভ করিতে পারিবেন না, নিশ্চয় হারিবেন, কেননা তাঁহার প্রতি শনির দৃষ্টি হইয়াছে।

এই কথায় সকল সেনার হৃৎকম্প হইল, সেনাধ্যক্ষগণ অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন, বাবর সেনাগণকে সাহস দিয়া কোন্ কথা কহিবেন এমন সাধ্য রহিল না, অধিকন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সকল হিন্দু সেনা ছিল তাহারা অনেকে বিপক্ষদলে গিয়া মিশিল।

বাবর জবিস্যদ্বক্তার বাক্যে দৃক্‌পাত করিলেন না, কিন্তু সংগ্রামের বল সৈন্য, যদি তাহারাই দুর্বল হইল তবে কাহাকে লইয়া যুদ্ধ করিবেন। অতএব তাহাদের সাহস বৃদ্ধির জন্য তিনি আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শ্মশ্রু ধারণ করিলেন, এবং মদ্য পান ত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পানপাত্র সকল দীন দরিদ্র অনাথ দিগকে দান করিলেন। অধিকন্তু তিনি অঙ্গীকার করিলেন যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এ সংগ্রামে জয়ী হইতে পারি তবে মুসলমানদিগের স্থানে আর কখন শুল্ক গ্রহণ করিব না।

অনন্তর বাবর সেনাধ্যক্ষ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের কীর্ত্তিই সজীব ও অক্ষয় পদার্থ, জীবন কিছুকালের নিমিত্ত মাত্র। মনুষ্যের জীবনান্ত হইলে তাহার জীবনের কোন চিহ্ন থাকে না, কিন্তু কীর্ত্তি চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকে। অতএব অক্ষয় কীর্ত্তির জন্য মৃত্যুকে ভয় করা মনুষ্যের উচিত নহে। ইহা বলিয়া তিনি শাহানামার এক কবিতা পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া সকল সেনার বল ও সাহস বৃদ্ধি হইল, তাহাতে তাহারা কোরাণ স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিল

এ যুদ্ধে প্রাণপণ করিলাম হয় সংগ্রাম জয় করিব, নতুবা প্রাণ ধারণ করিব না।

সৈনাগণ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলে পর, বাবর যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। হিন্দু রাজাদিগের সহিত অসঙ্খ্য অশ্বারোহী সেনা ছিল, ইহারা যদিও উত্তম শিক্ষিত না হউক কিন্তু অত্যন্ত সাহসিক। বাবরের যে সকল অশ্বারোহী সেনা ছিল তাহারা লঘু অস্ত্রধারী, কেবল পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইবার যোগ্য, রণক্ষেত্রে থাকিয়া উত্তম রূপ যুদ্ধ করিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তাঁহার কামান ও বন্দুক প্রধান বল ছিল। অতএব কামান সকল শৃঙ্খল-যুক্ত করিয়া সম্মুখে প্রাচীরবৎ সারী দিয়া রাখাইলেন, তাহার পরে অশ্বারোহী সৈন্যেরা দলবদ্ধ হইয়া এবং সর্ব্বপশ্চাৎ পদাতিক সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

বাবর এই প্রকার ব্যূহরচনাপূর্ব্বক রণসজ্জা করিলে পর হিন্দু সেনাগণ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তাঁহার সৈন্যগণকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বাবরের সৈন্যগণ বন্দুক ও কামান দ্বারা অবিশ্রান্ত অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে হিন্দু সেনাগণ একপদ অগ্রসর হইতে পারিল না মধ্যে মধ্যে হটিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার ঘোরতর যুদ্ধে প্রায় অর্দ্ধেক দিবা অতীত হইল, হিন্দু সেনাগণ ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বাবর তাহা বুঝিয়া দুই দল অশ্বারোহী সেনা লইয়া তাহাদিগকে অকস্মাৎ আক্র-

মণ করিলেন। হিন্দু সেনাগণ ঐ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাতে হাসন খাঁ প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান ২ সৈন্যাধ্যক্ষ সমরশয্যায় শয়ন করিলেন, সঙ্গা বহু কষ্টে পলায়ন করিলেন।

খ্রিঃ ১৫৩
শ. ১৪২৯ মার্চ ১৬

বাবর যুদ্ধ জয় করিলে পর ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ আরম্ভ করিল। বাবর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, অবশেষে কিছু অর্থ দিয়া একেবারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিলেন।

তদনন্তর বাবর মেওয়াত দেশে যাত্রা করিলেন। হাসেন খাঁ নামে এক পাঠান এই দেশের রাজা ছিলেন। তিনি কোন প্রকার উৎপাত না করেন এজন্য বাবর তাঁহার পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। সঙ্গার সঙ্গে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বাবর হাসেন খাঁয়ের পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হাসেন খাঁ তাহা না করিয়া সঙ্গার সঙ্গে মিলিলেন। এই আক্রোশে বাবর তাঁহার রাজ্য লইয়া আপন অধিকার ভুক্ত করিলেন।

অনন্তর যে সকল মোগল সৈনা স্বদেশ গমনে অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছিল বাবর তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া কাবুলে পুনঃ প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হোমায়ুনকে তাহাদের সঙ্গে দিলেন, তিনি তাহাদের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিলেন।

তৎপরে বাবর্ দেশের শান্তি বিষয়ে মনোযোগী হইয়া রাজ্য ও প্রজা পালনের সুনিয়ম করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মে তিনি বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন, এবং সকল দেশ সুন্দররূপ শাসিত হইল। কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যে কতকগুলিন পাঠান বাস করিত, তাহারা কোন প্রকারে রাজপ্রভুত্ব মানিল না। বাবর তাহাদিগের দমনার্থ এক দল সৈন্য পাঠাইলেন।

হিং ৯৩৫ } খৃঃ ১৫২৮ } পর বৎসর তিনি চন্দ্রেরীতে যাত্রা করিলেন। চন্দ্রেরী বুন্দলখণ্ড ও মালবের মধ্যবর্ত্তী। মেদিনী রায় নামে এক রজঃপুত্র এই স্থানের কর্ত্তা ছিলেন। মালবাধিপতি দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্ব কালে এই মেদিনী রায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া বলপূর্ব্বক মালব রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মহম্মদ, গুজরাটরাজের সহায়তায় তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে তিনি সঙ্গার সহযোগে চন্দ্রেরীতে রাজধানী করেন। এই মেদিনী রায় সঙ্গার সঙ্গে সিকরির যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে বাবর তাঁহার রাজ্যে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু রজঃপুত্রদিগের যেমন সাহস তাদৃক্ শিক্ষা বা ধৈর্য্যাবলম্বন নাই। অতএব মোগল সৈন্যেরা যে দিবস নগর বেষ্টন করিল তাহার পর দিবসই রজঃপুত্রেরা অধৈর্য্য ভাবে, আপন ২ স্ত্রী পুত্রদিগকে সংহার করিয়া, উন্মত্ত বেশে বাহির হইয়া শত্রুহস্তে একে একে তাবতে

নিধন প্রাপ্ত হইল। মেদিনী রায়ের গৃহ রক্ষার্থ যে দুই তিন শত সৈন্য ছিল তাহারাও আপনা আপনি কাটা-কাটি করিয়া মরিল। তাহাতে বাবর ঐ রাজ্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রী আক্রমণ কালে বাবর সংবাদ পাইলেন অযোধ্যা রাজ্য শাসন জন্য তিনি যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন বাবন নামে এক পাঠান তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি স্বয়ং ঐ স্থানে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে পাঠানেরা তথা হইতে বঙ্গ দেশে পলায়ন করিল। বাবর অযোধ্যা রাজ্য অধিকার করিয়া বিদ্রোহীদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন, এবং বোধ হয় ঐ সময়ে তিনি বেহার প্রদেশ জয় করিয়া থাকিবেন।

সঙ্গা রাজার বিয়োগান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইলেন। বাবর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নিকট হইতে রিন্তাম্বরের দুর্গ লইলেন। ঐ দুর্গ অতি প্রধান।

এই সময়ে বেহার প্রদেশে পুনর্ব্বার মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহার কারণ লোদী বংশীয় যে মহম্মদ-সাহ সঙ্গা রাজার সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন. তিনি ঐ রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। বোধ হয় বঙ্গ-দেশের রাজাও তাঁহার পৃষ্ঠপূরক ছিলেন।

যাহা হউক মহম্মদ লোদী বেহার অধিকার করিলে পর ঐ প্রদেশীয় তাবৎ পাঠানেরা তাঁহার সঙ্গে মিলিল, তাহাতে তিনি প্রায় লক্ষ সেনার অধিপতি হইয়া

বারাণস পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার সেনার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল, সুতরাং যখন বাবর রণসজ্জা করিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে অর্থাৎ আলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন, তখন ঐ সকল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহম্মদের পলায়ন ভিন্ন আর কোন উপায় রহিল না। মহম্মদ পলায়ন করিলে পর বাবর গঙ্গার দক্ষিণ ভাবং বেহারের কর্ত্তা হইলেন। উত্তর বেহার তখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশাধিপতির হস্তে ছিল। তিনি ঐ প্রদেশ আপনি রাখিবেন, এই মনন করিয়া বাবরকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিবার নানা প্রকার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু বাবর তাঁহার কথায় না ভুলিয়া একেবারে উত্তর বেহারে উপস্থিত হইলেন। তখন বঙ্গদেশীয় রাজা অগত্যা তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক সন্ধি বন্ধন করিলেন।

এই সন্ধির পর বাবর আগ্রাতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে শুনিলেন কতকগুলা পাঠান বাদনের সহযোগে পুনর্ব্বার অযোধ্যা অধিকার করিয়াছে। ঐ সংবাদ পাইয়া তিনি অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। পাঠানেরা তাঁহার আগমনে তথা হইতে পলায়ন করিল। তদনন্তর বর্ষারম্ভ হওয়াতে বাবর যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া আগ্রাতে প্রত্যাগমন করিলেন।

তদনন্তর বাবর পোনের মাস পর্য্যন্ত অতি পীড়িত অবস্থায় ছিলেন, সুতরাং আর কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন

নাই। এই পীড়াকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হোমায়ুন বাদকস্থান হইতে আসিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। ঐ পীড়াতে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইল, চিকিৎসকেরা অসাধ্য রোগ বলিয়া চিকিৎসাতে ক্ষান্ত দিলেন। বাবর হোমায়ুনকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, অতএব, তৎকালীয় রীত্যনুসারে, আপনার প্রাণ দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিলেন। বাবরের আত্মীয়গণ এই প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করণার্থে অনেক যত্ন পাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের বাক্য অবহেলন করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ ক্রিয়াদি করিলেন, তাহার পর তিন বার রাজপুত্রের শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া জপারম্ভ করিলেন। জপ সমাপন হইলে তিনি অতি প্রফুল্ল বদনে বলিলেন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল, এবং রাজপুত্রও নিশ্চিত জানিলেন তাঁহার পীড়া শেষ হইবে। অতএব সকল ইতিহাসলেখকেরা লিখিয়াছেন এই ক্রিয়ার পর অবধি হোমায়ুন আরোগ্য প্রাপ্ত হইলেন, এবং বাবরের পীড়া বৃদ্ধি হইয়া তিনি দিন ২ ক্ষীণ-কলেবর হইতে লাগিলেন।

অনন্তর যখন তাঁহার অন্তিম কাল নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তিনি আপন পুত্র ও মন্ত্রিগণকে নিকটে ডাকিয়া রাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে আপনার যে সকল অভিপ্রায় ছিল তাহা ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে সকলকে নির্ব্বিরোধে ও পুত্রদিগকে পরস্পর সম্প্রীতে থাকিতে আজ্ঞা করিয়া, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮ বৎসর

রাজত্বের পর, ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে, হিজরী ৯৩৭ অব্দে,

খৃ ১৫৩০, ডিসেম্বর ২৬ } আগ্রাতে প্রাণ ত্যাগ করি-
কং ৪৬৩২ পৌষ } লেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে

তাঁহার মৃত দেহ কাবুলে প্রোথিত হইল।

বাবরের চরিত্র অতি সুন্দর। ভারতবর্ষে যত মুসলমান রাজা হইয়াছিলেন, বাবর যদিও তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হউন, কিন্তু তিনি সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার তুল্য সাহস মনুষ্যের প্রায় হয়না। তিনি অনেক যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, এবং এক এক যুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার গোষ্ঠী-পতি তৈমুরলঙ্গও তদ্রূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীরে এমন বল ছিল যে তাহাকে দৈববল বলিলেও বলা যায়। নদী পার হইতে হইলে তিনি কখন জলযান আরোহণ করিতেন না, প্রায়ই সন্তরণ দ্বারা পার হইতেন, এবং শরীরকে এমন অনায়াসে চালাইতেন যে তাহা দেখিয়া লোকের বিস্ময় বোধ হইত।

বাবর কেবল সংগ্রামে পণ্ডিত ছিলেন এমন নহে, সংগীত শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং উত্তম ২ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। পারসী ভাষাতে যে কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন তিনি অতি সুলেখক ছিলেন, তাঁহার রাজ্যকালারম্ভ অবধি মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে দিবস যে ঘটনা হইয়াছিল, যখন যে ভাবে কাল যাপন করিয়াছিলেন, যে দেশে

যেরূপ রীতি নীতি দেখিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং তাহা সমস্ত বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছিলেন, ইহাতে রাজা বলিয়া কোন কথা গোপন রাখেন নাই, সুখ দুঃখ যখন যাহা হইয়াছিল সকলই প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে অনেক স্থানের বিবরণ আছে। তাঁহার রাজত্ব-সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লেখা গেল তাহার অধিকাংশই তাঁহার ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তাঁহার সদ্গুণেরও অনেক প্রশংসা করিতে হয়। তিনি অতি সরলস্বভাব, দানশীল এবং সদালাপী ছিলেন, এবং যদিও যুদ্ধের সময়ে কখনং জাতীয় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু অন্য সময় নিতান্তশত্রুর প্রতিও অত্যন্ত দয়া করিতেন। পূর্ব্বকালে এমত রীতি ছিল সংগ্রাম সময়ে পথিক বা যাত্রী দেখিলে সৈন্যেরা যাহার যাহা পাইত তাহা অপহরণ করিত, কিন্তু বাবর সৈন্যগণকে তাহা করিতে দিতেননা, ইহাতে তাঁহার সচ্চরিত্র বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে।

কিন্তু বাবরের রাজ্যশাসনে এই এক মহৎ দোষ দৃষ্ট হইতেছে যে দেশহিতজনক বা প্রজার হিতকর কোন কার্য্যে তিনি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। কেবল কতকগুলিন রাজপথ পান্থশালা ও জলাশয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বাবর অতি চঞ্চল স্বভাব ছিলেন, সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিতেন, একস্থানে কিছুকাল

স্থির থাকিতে পারিতেন না*। অনুমান হয় এই জন্য তিনি দেশহিতকর কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন নাই। যাহাহউক সেই একটা তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক। আর এক দোষ এই তিনি অত্যন্ত মদ্য পান করিতেন। এই কর্ম্ম তিনি পরে ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি পানেই তাঁহার শরীর একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

* তিনি আপনি লিখিয়াছেন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়া অবধি তিনি এক স্থানে কখন রমজানের রোজা দুইবার করেন নাই। প্রতি বৎসর নূতন২ স্থানে থাকিতেন এবং শেষে যখন পীড়িত হইয়াছিলেন তখনও এক২ দিবস অশ্বারোহণে চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

হোমায়ুন।

বাবরের চারি পুত্র ছিলেন হোমায়ুন, কামরান, হিন্দাল, ও মির্জ্জা আস্করী।

হোমায়ুন পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন বাবর জীবিত থাকিতেই ইহা ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে মন্ত্রীর বড় আধিপত্য থাকে না, এইজন্য মন্ত্রী, মেহেদীখাজা নামে রাজ-জামাতাকে রাজা দেওয়াইবেন এবং আপনি কর্ত্তৃত্ব করিবেন ইহার ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেবল বাবরের প্রাণত্যাগ হইবার অপেক্ষা ছিল। কিন্তু মন্ত্রীর প্রতি মেহেদীখাজার অত্যন্ত দ্বেষ ছিল, কোন কথাদ্বারা হঠাৎ তাহা প্রকাশ হওয়াতে মন্ত্রী তাঁহাকে রাজা দেওয়াইবার কল্পনা ত্যাগ করিলেন, সুতরাং হোমায়ুন নির্ব্বিঘ্নে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

বাবরের আর তিন পুত্রকে অন্য কোন রাজত্ব দিবার প্রস্তাব হয় নাই, তাহার কারণ রাজ্যবিভাগে অনেক উৎপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র কামরান কাবুল ও কান্দারের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কোনপ্রকারে জ্যেষ্ঠের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না, অতএব সৎস্বভাব হোমায়ুন তাঁহাকে ঐ রাজ্য ও পঞ্জাব প্রদেশ একেবারে সমর্পণ

করিলেন। এবং হিন্দালকে সম্বল ও মির্জা আস্করীকে মেওয়াত রাজ্য প্রদান করিলেন। পিতার স্বতন স্বোপার্জ্জিত হিন্দুস্থান মাত্র তাঁহার নিজের রহিল।

হোমায়ুন সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, একজন্য সপ্ত গ্রহের সম্মানার্থ তিনি সাতটি গৃহ সুসজ্জিত করিয়া প্রত্যেক গৃহে এক এক গ্রহের নাম দিয়াছিলেন, এবং যখন যেপ্রকার লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখন তাহার কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তদুপযুক্ত স্থানে, অর্থাৎ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় লোকদিগকে মঙ্গলের গৃহে, বিদ্বান লোকদিগকে বুধের গৃহে, রাজদূত, বা ভ্রমণকারি দিগকে চন্দ্রের গৃহে, এবং আর২ লোক দিগকে যথোপযুক্ত গৃহে আহ্বান করিতেন।

এই প্রকার রাজ্যারম্ভ করিয়া কিয়দ্দিবস পরে হোমায়ুন কালিঞ্জরের দুর্গ অধিকার করণার্থ বুন্দেলখণ্ডে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্গ বেষ্টন করিলে পর শুনিলেন যাবন পুনর্ব্বার জুয়ানপুরে রাজবিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া হোমায়ুন অবিলম্বে তথায় যাইয়া বিদ্রোহ নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি

হিং ৯৩৯
খৃ ১৫৩৩

বারাণস সান্নিধ্যে চণ্ডালগড় আক্রমণ করিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বৈরী সের খাঁ তৎকালে এই দুর্গের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি হোমায়ুনের নিকট নত হইলেন বটে, কিন্তু দুর্গ তাঁহার হস্তে থাকিল। তদনন্তর হোমায়ুন আগ্রাতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পূর্ব্বে লেখাগিয়াছে হোমায়ুনের ভগ্নীপতিকে রাজ্য দি-বার কুমন্ত্রণা হইয়াছিল। ঐ কুমন্ত্রণা প্রকাশ হইলে মেহে-দীখাজা গুজরাটে পলায়ন করেন। এবং তত্রত্য রাজা বাহাদুর খাঁ তাঁহাকে আপন আশ্রয়ে রাখেন। হোমা-য়ুন এই সংবাদ পাইয়া বাহাদুর খাঁকে পত্র লিখিলেন তিনি মেহেদীকে পাঠাইয়াদেন। কিন্তু বাহাদুর খাঁ তৎ-কালে অতি পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ খন্দেব বেরার ও আহম্মদনগরের রাজারা তাঁহার আজ্ঞাকারী এবং সমুদয় মালব রাজ্য তাঁহার করস্থ ছিল। এই অহ-ঙ্কারে তিনি হোমায়ুনের কথা অবহেলন করিয়া তাঁহার ভগ্নীপতিকে পাঠাইলেন না। তাহাতে উভয়ে পরস্পর বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরে বাহাদুর খাঁ মত্তগর্ব্ব হইয়া দিল্লীরাজ্য লইবার মানসে অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুত্র তাতার খাঁকে আগ্রাতে পাঠাইলেন। তাতার খাঁ মহা সমারোহ পূর্ব্বক আগ্রাতে যাত্রা করিয়া ঐ রাজধানী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে হত হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল।

এই জয়োল্লাসে কিম্বা পূর্ব্ব কল্পনানুসারেই হউক, হো-মায়ুন বাহাদুর খাঁর গর্ব্বখর্ব্ব জন্য গুজরাটে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে বাহাদুর খাঁ মিবারের রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চিত্তোরের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মিবারের রাজা হিন্দু। মুসলমানশাস্ত্রে হিন্দুদিগকে কাফর অর্থাৎ নাস্তিক বলিয়াথাকে। অতএব যদি কোন মুসল-

মান কাফরকে নির্যাতন করিতে উদ্যত হয়, মুসলমান-শাস্ত্রানুসারে তাহাকে কোন প্রকার বাধা দেওয়া অবিধি, এই বিবেচনায় হোমায়ুন গয়ংগচ্ছ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অনন্তর বাহাদুর খাঁ চিতোরের দুর্গ জয় করিলে দিল্লীশ্বর তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন।

বাহাদুর খাঁ কনস্তান্তিনোপল দেশীয় এক জন তুর্কী ও কতকগুলিন পোর্তুগী চাকর রাখিয়াছিলেন, তাহারা আগ্নেয় যুদ্ধে অর্থাৎ গোলাগুলির কর্ম্মে অতি পারগ, অতএব তাহাদের বলে নির্ভর করিয়া তিনি মান্দেশ্বরে হোমায়ুনের অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। হোমায়ুন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সৈন্যজালে বেষ্টন করিলেন। তাহাতে সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়নের পথ রুদ্ধ হইল। সুতরাং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় বাহাদুর তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া, রাত্রিকালে কামান সকলের মুখে বারুদ অর্পণ করিয়া, আপনি একাকী মাণ্ডুতে পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণ পশ্চাতে রহিল। হোমায়ুন বাহাদুরের পশ্চাৎ২ মাণ্ডুতে গমন করিলেন। তাহাতে বাহাদুর তথা হইতে চাম্পানরে, তৎপরে কাম্বে, অবশেষে সমুদ্রের গর্ব্ভে পলাইলেন। হোমায়ুন তাহাকে বন্দী করিতে না পারিয়া চাম্পানরে আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। চাম্পানরের দুর্গ পর্ব্বতশিখরে, তাহার দ্বার রুদ্ধ করিলে তাহা উল্লঙ্ঘন করা কঠিন। হোমায়ুন যেরূপ সাহসে ও কৌশলে এই দুর্গ অধিকার করিলেন তাহা অতি আশ্চর্য্য। তিনি

রাত্রিযোগে কতকগুলি সৈন্যকে দুর্গদ্বার আক্রমণে নিযুক্ত করিলেন। দ্বার আক্রান্ত হইলে দুর্গরক্ষক সেনাগণ দ্বার রক্ষার্থ গমন করিল, অন্য দিক প্রায় রক্ষকশূন্য হইল। হোমায়ুন ঐ সময়ে তিন শত সাহসী সেনা সমভিব্যাহারে দুর্গের প্রাচীরে লৌহশলাকা প্রোথিত করিয়া একে একে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। দুর্গের ভিতর পড়িয়া মহামারী আরম্ভ করিলেন, যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই সংহার করিতে লাগিলেন। যে সৈন্যগণ দ্বার আক্রমণ করিয়াছিল তাহারাও ঐ সময়ে চাপিয়া পড়িল। এই প্রকারে অনায়াসে দুর্গ জয় হইল। এই কর্ম্ম সামান্য নহে, তাঁহার পিতা ও তাঁহার গোষ্ঠীপতি তৈমুর অতিবিখ্যাত বীর হইয়াও এপ্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

গুজরাট জয়ের পর হোমায়ুন স্বীয় ভ্রাতা মির্জা আস্করীকে তথায় রাখিয়া আগ্রা প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনিও গুজরাট ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মধ্যে মহা বিসংবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্থির করিলেন মির্জা আস্করীকে রাজসিংহাসন দেওয়াইবেন। কিন্তু এই সকল যুক্তি নিষ্ফল হইয়া যাতে হইতে আত্মবিচ্ছেদ ও বলক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে বাহাদুর খাঁ বিনাযুদ্ধে অনায়াসে গুজরাট রাজ্য পুনরধিকার করিলেন। এবং তখন মালবদেশে যদিও কোন উপদ্রব বা বিদ্রোহ ছিলনা তথাপি মোগলদিগকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল।

ইতিমধ্যে সেরখাঁ ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। সেরখাঁ পাঠানজাতীয়। তাঁহার পিতামহের নাম এব্রাহেম। এব্রাহেম আপনাকে গোররাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। এব্রাহেমের পুত্র হাসন কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ব্ভে সেরখাঁ ও নিজাম খাঁ দুই পুত্র জন্মে। কিন্তু হাসনের এক উপপত্নী ছিল, তাহার বশতাপন্ন হইয়া তিনি পুত্রদিগকে তাচ্ছল্য করিতেন, একজন্য সেরখাঁ পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া জুয়ানপুরে এক সিপাহির কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। তথায় বিদ্যানুশীলনে মনোযোগ করিয়া নানা কাব্য ও ইতিহাস পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। এবং সেখ সাদীর পুস্তকখানি এমন অভ্যাস করিলেন যে তাহা অনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারিতেন। এইরূপ কিছু কাল অতীত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি অনুকূল হইলেন, এবং বেহারের অন্তঃপাতী সসরামে তাঁহার যে জায়গীর ছিল তাঁহাকে তাহার কর্ত্তৃত্বের ভার দিলেন। সেরখাঁ বেহারে থাকিয়া পিতৃদত্ত জায়গীরের কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে শলিমান নামে তাঁহার পিতার জারজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জায়গীর-সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত করিলেন। তাহাতে সেরখাঁ ও তাঁহার সহোদর, নিজাম খাঁ, সেকন্দর সাহের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দিল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হইল, তাহাতে সেরখাঁ সসরামের জায়গীর

পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। পরে মহম্মদ সাহ লোহানী জুয়ান-পুর ও বেহারের রাজা হইলে, তিনি তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া কিছুদিন সম্মানে থাকিলেন। তদনন্তর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শলিমান রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পাকচক্র করিয়া তাঁহাকে জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিলেন। তখন সেরখাঁ মহম্মদ লোহানীর সভা ত্যাগ করিয়া জুয়ানপুরে যাইয়া বাবরের পক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত মিলিলেন। এবং ঐ সৈন্যাধ্যক্ষের সাহায্যে বেহারের পর্ব্বতের কতকগুলি লোকের সহিত যোগ করিয়া আপনার জায়গীর পুনর্ব্বার উদ্ধার করিলেন। তৎপরে আপনাকে বাবরের প্রজা বলিয়া মহম্মদ লোহানীর রাজ্যে উপদ্রব করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে চান্দেরীর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সের খাঁ বাবরের সমভিব্যাহারে ঐ যুদ্ধে গমন করিলেন, তাহাতে বাবর তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে বেহারের সেনা-ধ্যক্ষ করিলেন। তদনন্তর হিং ৯৩৬ অব্দে মহম্মদ লোদী বেহার অধিকার করিলে, তিনি বাবরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মহম্মদের সহিত মিলিলেন। পরে যখন ঐ মহম্মদের সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইল, তখন তিনি পুনর্ব্বার বাবরের শরণাগত হইলেন।

সেরখাঁ এইপ্রকার অনেক গোলমাল করিলেন। কিছু-দিন পরে মহম্মদ লোহানী, জলাল নামে এক শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। জলালের মাতা তাঁহার কর্ম্মকর্ত্রী হইয়া বাবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। তা-

হাতে বাবর তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া তাঁহাকে বেহার প্রদেশ অর্পণ করিলেন। সেরখাঁ ঐ সময়ে জলালের মাতার অনুগত হইয়া তাঁহার সকল বিষয়ের অধ্যক্ষ হইলেন। এবং তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া তাবৎ বেহার ও চণ্ডালগড় ও রোটাস অধিকার করিলেন। এই প্রকারে সেরখাঁ ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন।

ইতিপূর্ব্বে হোমায়ুন যখন চণ্ডালগড় আক্রমণ করেন, তখন সেরখাঁ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র কতকগুলি অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিবেন। কিন্তু যখন হোমায়ুন গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন সের খাঁর পুত্র তাঁহার সঙ্গে যান নাই। হোমায়ুন তৎসময়ে গুজরাটের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, এজন্য তাহার প্রতীকার করিতে পারেন নাই। হোমায়ুন গুজরাটে গমন করিলে সেরখাঁ সমুদায় বেহার অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলেন।

বঙ্গদেশ আক্রমণের আর এক সূত্র হইয়াছিল। সেরখাঁ জলাল লোহানীর কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া আপনিই সকল কর্ত্তৃত্ব করিতেন, জলালকে কিছু করিতে দিতেন না, তিনি কেবল প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় থাকিতেন। এই মনোদুঃখে তিনি বঙ্গদেশীয় রাজাকে পত্র লিখিলেন, আমাকে ঐ ব্যক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন। বঙ্গাধিকারী জলালের সাহায্যে

প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেরখাঁ সেই আক্রোশে গৌড় রাজধানী আক্রমণ করিলেন।

যখন সেরখাঁ বঙ্গদেশ আক্রমণে প্রবৃত্ত, তখন হোমায়ুন গুজরাট হইতে রাজধানী প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, সেরখাঁ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াছেন, তাঁহাকে দমন না করিলে রাজ্যের কুশল নাই। অতএব তিনি সসৈন্য আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন।

সেরখাঁ বিবেচনা করিলেন যদি হোমায়ুন একেবারে বঙ্গদেশে আইসেন তাহা হইলে তাঁহার ঐ দেশ জয় করা হয় না, অতএব চণ্ডালগড়ে কতকগুলি সেনা রাখিয়া তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন মোগল সৈন্য তথায় উপনীত হইলে তাহাদিগকে এখানে আটক করিয়া যত বিলম্ব করিতে পারে করিবে, শীঘ্র আসিতে দিবে না। সেনাগণ এই আজ্ঞাক্রমে হোমায়ুনের পথাবরোধ করিল। হোমায়ুন নিরুপায় হইয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। বারুদ দ্বারা দুর্গ ভেদ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। কয়েক মাস পরে দুর্গরক্ষক সৈন্যগণের আহার দ্রব্য শেষ হইলে তাহারা আপনারাই পরাভব মানিল। দুর্গের মধ্যে তিন শত জন গোলন্দাজ ছিল, হোমায়ুন রাগবশতই হউক, বা ভবিষ্যতে তাহারা আর গোলন্দাজী কর্ম্ম করিতে নাপারে এই অভিপ্রায়েই হউক, তাহাদের সকলের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন।

চণ্ডালগড় জয়ের পর হোমায়ুন পথ পাইয়া গঙ্গার

ধার দিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পাটনার সান্নিধ্যে আসিয়া দেখিলেন বঙ্গদেশের রাজা মহম্মদ রাজ্যচ্যুত হইয়া তথায় রহিয়াছেন, সের খাঁ তাঁহার রাজা হইয়াছেন। পরে ভাগলপুর উত্তীর্ণ হইয়া শুনিলেন জলাল নামে সের খাঁর এক পুত্র সসৈন্যে সকরীগলির পাহাড়ে আছেন। অতএব পাহাড়ের খোনা অধিকার জন্য তিনি অগ্রে কতকগুলি সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু উঁহারা ঐ স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র জলাল পর্ব্বত হইতে নামিয়া তাহাদিগকে সংহার করিলেন। হোমায়ুন এই সংবাদে স্বয়ং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। কিন্তু যাইয়া দেখেন জলাল তথা হইতে পলায়ন করিয়াছেন। অতএব তিনি নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন।

হোমায়ুন গৌড় রাজ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন সের খাঁ ঐ রাজ্য জয় করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব অবাধে ঐ রাজধানী অধিকার করিলেন। কিন্তু তৎপরেই বর্ষারম্ভ হইয়া তাবদ্দেশ জলপ্লাবিত হইল, তাহাতে যুদ্ধের কল্পনা বৃথা হইল, তিনি গতি রহিত হইয়া থাকিলেন। তাঁহার সেনাগণ বঙ্গদেশের জলীয় বায়ুদোষে পীড়িত হইতে লাগিল, এবং অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। হোমায়ুন কি করেন তখন প্রত্যাগমন করিতে না পারিয়া বর্ষায় কয়েক মাস বঙ্গদেশে বদ্ধ হইয়া থাকিলেন।

ইতিমধ্যে সের খাঁ আপন ধন ও পরিজনাদি রোটাসের দুর্গে রাখিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক তাবৎ বেহার ও চণ্ডালগড় ও বারাণসী অধিকার করিলেন, তৎপরে জোয়ানপুর আক্রমণ করিয়া কানাকুব্জ পর্য্যন্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তাহারা গঙ্গাতীরস্থ তাবৎ দেশ অধিকার করিতে লাগিল।

হোমায়ুন বর্ষান্তে বঙ্গদেশ হইতে স্বদেশ যাত্রা করিয়া গঙ্গার দক্ষিণ ধার দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বক্সর উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন সের খাঁ তাঁহার পথাবরোধ জন্য জোয়ানপুর হইতে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। হোমায়ুন তাঁহার সৈন্য উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে না পারিয়া, গঙ্গার পর পারে দিয়া যাইবেন এই মানসে নৌকার সেতু প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এই কর্ম্ম দুই মাস পর্য্যন্ত হইতে লাগিল, ইহার মধ্যে সের খাঁ কোন প্রকার বিঘ্ন দিলেন না। কিন্তু যখন সেতু প্রস্তুতপ্রায় হইল তখন তিনি এক দিবস রাত্রিযোগে কতকগুলি সেনা লইয়া হোমায়ুনের সৈন্যমণ্ডলীর পশ্চাদ্ভাগে গোপন ভাবে থাকিলেন। রাত্রি প্রভাত না হইতেই একবারে তিন দিক হইতে তাঁহার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন।

হোমায়ুন কিছুই জানিতেন না, তথাপি শত্রু আগত মাত্র অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তখন যুদ্ধ করা বিফল, সমরসজ্জা করিতেং সৈন্যগণ শমনালয়ে গমন করে, এজন্য তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিষেধ

করিয়া বলিলেন, এ সময়ে যুদ্ধ করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না, এক্ষণে আপনার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা দেখুন। ইহা বলিয়া তাঁহার অশ্বরশ্মি নদীমুখে ফিরাইয়া দিলেন। হোমায়ুন নদীতটে যাইয়া একেবারে তুরঙ্গ সমেত তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। কতক দূর যাইয়া তুরঙ্গ জলমগ্ন হইল। হোমায়ুনেরও সেই দশা ঘটিত, দৈবাধীন তৎকালে এক জন ভিস্তী বায়ুপূরিত মসক অবলম্বন করিয়া নদীপার হইতেছিল, সে হোমায়ুনকে সঙ্গে লইয়া নদী পার করিয়া দিল। হোমায়ুন তাহার পর আগ্রাতে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে তাঁহার সেনাগণ শত্রুজাল অতিক্রম করিতে না পারিয়া কতক স্থলে কাটা পড়িল, কতক বা জলমগ্ন হইয়া মরিল, প্রায় কেহই বাঁচিল না। হোমায়ুনের রাণীও শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সের খাঁ তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিলেন না। তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়া সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, রাণী তথা হইতে স্বদেশে গমন করিলেন।

এই ঘটনার পর সের খাঁ বঙ্গদেশ পুনরধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দাল হোমায়ুনের দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক দিল্লী অধিকারের উপক্রম করিলেন। কামরান এই বিদ্রোহ নিবারণচ্ছলে কাবুলে সমাগত হইলেন। তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল যদি সুযোগ হয় আপনি রাজ্যাধিকার করিবেন। কিন্তু

হোমায়ুন ঐ সময়ে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন, তাহাতে উঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না।

পরে হোমায়ুন পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সের খাঁর প্রতিকার জন্য, কানাকুবেজ যাত্রা করিলেন। কিন্তু গঙ্গা পার না হইতে হইতে সের খাঁ পরপারে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে হোমায়ুন পার হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁহার এক জন প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপন অধীন সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। বিলম্ব করিলে পাছে আর ২ সেনারা সেই প্রকার পলায়ন করে এই আশঙ্কায় হোমায়ুন

খ্রি: ১৫৪০।১০ মহরম
বং ১৫৪০।১৬ মে

অবিলম্বেই সৈন্য পার করিলেন। তৎপরেই যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধেও হোমায়ুন পরাস্ত হইলেন, এবং তাঁহার সেনাগণ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নদীর গর্ত্তে পড়িতে লাগিল। এই বিপদকালে হোমায়ুনের অশ্ব আহত হইলে, তিনি এক মাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কোন প্রকারে নদী পার হইলেন। কিন্তু হস্তী এমন স্থানে যাইয়া উঠিল যে সেস্থান হইতে তটারোহণের কোন উপায় ছিলনা, তাহাতে সেই-থানেই তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা হইল। দৈবায়ত্ত দুই জন মোগল সেনা তটহইতে আপনাদের দুইটা পাগড়ি একত্র করিয়া ঝুলাইয়া দিল, হোমায়ুন তাহা অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিলেন।

এই দুর্দ্দৈবের পর হোমায়ুন রাজধানীতে উপনীত

হইলে, তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল ও মির্জা আস্করী তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় আসিলেন। কিন্তু স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ না করিলে রাজ্য রক্ষা করা কঠিন, এই বিবেচনায় হোমায়ুন, আগ্রা ও দিল্লী হইতে, পরিবারগণ লইয়া পঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। সের খাঁ কাবুল রাজ্য আক্রমণ না করেন এই অভিপ্রায়ে কামরান তাঁহাকে পঞ্জাব প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সম্প্রীতি করিলেন। কিন্তু কি জানি পাছে কামরান তাঁহাকে শত্রুহস্তে অর্পণ করেন এই আশঙ্কায় হোমায়ুন পঞ্জাবে সুস্থির হইতে না পারিয়া সিন্ধু রাজ্যে গমন করিলেন। সিন্ধু রাজ্য পূর্ব্বে দিল্লীভুক্ত ছিল, তাহাতে তিনি মনে২ করিলেন ঐ স্থানে তাঁহার প্রভুত্ব চলিবে, অতএব অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়া তাহার নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিন্ধুরাজ তাঁহার সহিত সৈত্রাচরণ না করিয়া অবশেষে বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

তখন হোমায়ুন সিন্ধু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মারোয়ারের রাজা মালদেবের শরণাগত হইবার মানসে বালুকারণ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু যোধপুরে যাইয়া শুনিলেন মালদেবের নিকট গমন করা নিষ্ফল, তিনি তাঁহার পরম শত্রু, অতএব সিন্ধুতটে অমরকোটে গমন করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার বালুকারণ্যে পড়িলেন। বালুকারণ্য পার হইতে তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকেরা যে কষ্ট পাইলেন তাহা নভূতো ন ভবিষ্যতি। একে বালি

ভাঙ্গিয়া পথ চলা কঠিন, তাহাতে রৌদ্রের উত্তাপে ঐ সকল বালুকা অগ্নিবৎ হইয়াছিল, ঐ বালুকাতে পদ প্রক্ষেপ করা দুঃসাধ্য। মধ্যে২ বহ্নিবৎ বাতাসে শরীরকে একবারে দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা জলকষ্টই প্রধান। এই পথের মধ্যে জল প্রায়ই পাওয়া যায় না, যে স্থানে যৎ-কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় তথাকার লোকেরা তাহা স্বর্ণ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিয়া কাহাকে স্পর্শ করিতেও দেয় না। জলের জন্য গ্রামস্থ লোকদিগের সঙ্গে লাঠালাঠি কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইতে লাগিল, তথাপি জলের দুঃখ দূর হইল না। এক দিন একটা কূপে জলপাত্র নামাইয়া জল উত্তোলন কালে জলের জন্য সকলে এমন ব্যতিব্যস্ত হইল যে তাহাতে রজ্জু ছিন্ন হইয়া জলপাত্র সমেত জল-প্রয়াসী ভাবতে কূপের মধ্যে পড়িয়া মরিল।

এই প্রকার পথক্লেশ ও জল কষ্টের সময়ে মালদেব রাজার পুত্র সৈন্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। তাঁহার কতকগুলা সেনা অগ্রে আসিয়া কূপ সকল আটক করিল। জীবনাভাবে কাহারও জীবন রক্ষার উপায় রহিল না। কিন্তু মালদেব রাজার পুত্র হোমায়ুনের নিকট-বর্ত্তী হইয়া শ্বেত পতাকা তুলিয়া দিলেন, তাহাতে বোধ হইল তাঁহার শত্রুভাব নহে। তদনন্তর তিনি হোমা-য়ুনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিলেন হিন্দুরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গোহত্যা করা আপন-কার উচিত ছিল না। ইহা বলিয়া জীবনদান পূর্ব্বক তিনি

বিদায় হইয়া গেলেন। হোমায়ুন যেমন যাইতেছিলেন তেমনি চলিলেন। কিন্তু জলকষ্ট ঘুচিল না, জলাভাবে তাঁহার সমভিব্যাহারী সকলেই ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল।

রাজরাণীও* যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলেন। তিনি তৎকালে গর্ব্ভবতী, এবং রাজার এক কর্ম্মকারীর অশ্বে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ কর্ম্মকারীর নিজের অশ্ব চলৎশক্তিরহিত হইল, তাহাতে তিনি গর্ব্ভবতী রাণীকে উক্ত ঘোটকহইতে অবরোহণ করাইয়া আপনি তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিলেন। তখন হোমায়ুন কি করেন, আপন অশ্বে রাণীকে আরোহণ করাইয়া আপনি পদব্রজে তাঁহার সঙ্গে২ চলিলেন। এই প্রকার মহাকষ্টে হোমায়ুন গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ তাঁহার সকল সমভিব্যাহারী লোক মারা পড়িল, কেবল সাত জন মাত্র জীবিত রহিল। এই সাত জন লোক সঙ্গে করিয়া তিনি অমরকোটে উপনীত হইলেন। তাহার পর তাঁহার আর২ লোক আসিয়া মিলিল। অমরকোটের রাজা প্রসাদ অতি ভদ্রলোক, হোমায়ুন উপনীত হইলে তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আপন গৃহে রাখিলেন।

---

* হোমায়ুন যৎকালে সিন্ধু অঞ্চলে অবস্থিতি করেন, তখন হিন্দালের আলয়ে এক দিবস মহোৎসব হইয়াছিল। তাহাতে হামিদা বানু নামে পারস্য দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের এক কন্যা আসিয়াছিলেন। হোমায়ুন তাঁহার অসাধারণ রূপ লাবণ্য দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি এই রাজরাণী।

হি ৯৪৯
খৃ ১৫৪২
১৪ আকবর

যখন হোমায়ুন অমরকোটে বাস করেন তখন তৎপুত্র বিখ্যাত আকবর তথায় জন্ম গ্রহণ করেন। আকবরের ভূমিষ্ঠ হওন কালে হোমায়ুন স্থানান্তরে ছিলেন। ঐ দেশে এমত রীতি আছে পুত্র কন্যা হইলে পিতা আত্মীয় পারিষদ সকলকে কিছু২ ধন দান করিয়াথাকেন। কিন্তু যখন আকবর জন্ম-গ্রহণ করিলেন তখন হোমায়ুনের কিছু মাত্র সঙ্গতি ছিল না, কেবল একটী মৃগনাভি ছিল। তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া উপস্থিত সকলকে এক এক কণা দিয়া বলিলেন মৃগনাভির যেমন সৌরভ পৃথিবীতে আমার পুত্রের যেন সেই প্রকা সৌরভ হয়।

হোমায়ুন অমরকোটে থাকিয়া সিন্ধুরাজ্য উদ্ধারের বাসনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে এক শত মোগল সেনার অধিক ছিল না, তাহাতে রাজা প্রসাদ প্রভৃতি আরং কয়েক জন হিন্দু রাজা ভদ্রতা পূর্ব্বক প্রায় ১৫০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুরাজ্য উদ্ধারার্থ তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কেমন দুর্ভাগ্য, একটী সামান্য কার্য্যের জন্য সকল উদ্যোগ ভঙ্গ হইল। তাহার কারণ, হোমায়ুনের সঙ্গী কোন মোগল রাজা প্রসাদকে অপমান করিল। প্রসাদ অপমানিত হইয়া হোমায়ুনকে জানাইলেন, কিন্তু হোমায়ুন তাহার বিচার করিলেন না। ইহাতে প্রসাদ ও তাঁহার সঙ্গী রাজারা তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

হোমায়ুন প্রসাদের গমনের পর সিন্ধুরাজ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া কান্ধারে ভ্রাতার সদনে প্রস্থান করিলেন, এবং মনেং যাহাই থাকুক, গমন করিতেং এই কথা রাষ্ট্র করিলেন যে তাঁহার পুত্রকে ভ্রাতার নিকটে রাখিয়া তিনি মক্কা তীর্থে গমন করিবেন। কিন্তু কান্ধারের কিয়দ্দূরে উপনীত হইলে হঠাৎ কোন ব্যক্তি তাঁহাকে সংবাদ দিল মির্জা আস্করী আগত প্রায়, তিনি আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র হোমায়ুন শশব্যস্ত হইয়া রাণীকে স্বীয় অশ্বে আরোহণ করাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন, শিশু আকবর তথায় পড়িয়া রহিলেন, তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বে মির্জা আস্করী তথায় উপনীত হইলেন, এবং ভ্রাতাকে না দেখিয়া খেদ করিয়া বলিলেন তিনি কেন পলাইলেন আমি তাঁহার অনিষ্ট বাঞ্ছায় আসি নাই, ইষ্ট বাঞ্ছায় আসিয়াছিলাম। ইহা বলিয়া তিনি শিশু আকবরকে লইয়া কাবুলে যাত্রা করিলেন।

হোমায়ুন কান্ধারের অধিকার ত্যাগ করিয়া পারস্যস্থানের অন্তঃপাতি সিস্থানে উপনীত হইলে, তত্রস্থ সেনারক্ষক তাঁহাকে হিরাটে প্রেরণ করিয়া পারস্যস্থানের রাজাকে সবিশেষ সংবাদ লিখিলেন। শাহতমাস্প তৎকালে পারস্যস্থানের রাজা ছিলেন। তিনি হোমায়ুনের আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক অতি সম্মানে রাখিলেন। হোমায়ুন সচ্ছন্দে থাকিলেন।

শাহ তমাস্প শিয়া* মতাবলম্বী ছিলেন, সতত ঐ মতের বৃদ্ধি বাসনা করিতেন। অতএব হোমায়ুন তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে স্বীয় মতাবলম্বী করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। হোমায়ুন প্রথমতঃ শিয়া মত গ্রহণে সম্মত হয়েন নাই, পরে তাহা গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন যে, ভারতবর্ষে ঐ মত প্রচার করিবেন। ঐ অঙ্গীকারপত্রে ইহাও লেখা রহিল পারসস্থানের রাজা তাঁহাকে কান্ধার রাজ্য উদ্ধারার্থে ১২০০০ সেনা দিবেন, যদি হোমায়ুন ঐ সৈন্য দ্বারা কান্ধার জয় করিতে পারেন তাহা হইলে ঐ রাজ্য পারসস্থানের রাজাকে অর্পণ করিবেন।

এই প্রকার অঙ্গীকারের পর হোমায়ুন পারসস্থান হইতে সিস্থানে যাত্রা করিলেন। তৎকালে তাঁহার নিজ সৈন্য ৭০০ মাত্র ছিল। সিস্থানে উপনীত হইলে পারসস্থানের রাজার পুত্র, মুরাদ মির্জা, ১৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিলেন। হোমায়ুন তৎসমভিব্যাহারে হেলমন্দ নদীর তীরে বোস্তনগর জয় করিয়া কান্ধারে যাত্রা করিলেন। কান্ধারে তাঁহার ভ্রাতা

* মুসলমান দিগের মধ্যে দুই মতাবলম্বী লোক আছে; সুন্নি ও শিয়া। সুন্নিরা এই কথা বলেন মহম্মদের মৃত্যুর পর যে তিন জন বোগদাদের রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা তদ্বংশীয়, এবং তাঁহারা প্রকৃত উত্তরাধিকারী। শিয়ারা বলেন ঐ তিন জন প্রতারক, মহম্মদের বংশীয় নহে, চতুর্থ রাজা আলি মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। পারসস্থানে এই মতের স্ফূর্তি।

মির্জা আস্করী কামরানের পক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি পাঁচ মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। হোমায়ুন দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না, অতএব নৈরাশ হইয়া তথা হইতে উঠিয়া যাইবেন এইমত কল্পনা করিতে ছিলেন এমন সময় তদ্দেশীয় অনেক লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিল, কিছুকাল পরে দুর্গের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তাহাতে দুর্গরক্ষক কতক সৈন্য নগরে প্রস্থান করিল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ হোমায়ুনের সঙ্গে মিলিল। মির্জা আস্করী সুতরাং দুর্গ রক্ষায় অক্ষম হইয়া হোমায়ুনের শরণাগত হইলেন। হোমায়ুন কান্ধার অধিকার করিয়া আজ্ঞা দিলেন মির্জা আস্করী গলদেশে অসি বন্ধন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিবেন। মির্জা আস্করী তাহাই করিলেন, তদনন্তর তিনি তাঁহার অভদ্র ব্যবহার জন্য তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

কান্ধার জয়ের পর ঐ রাজ্য পারসস্থানের রাজ্যভুক্ত হইল, তাহাতে অনেক ইরাণী সেনা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। কেবল রাজপুত্র মুরাদ মির্জা দুর্গ রক্ষার উপযুক্ত কতকগুলিন সেনা লইয়া তথায় থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে হঠাৎ ঐ রাজপুত্রের মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র হইল। তদনন্তর হোমায়ুন নগর প্রবেশ পূর্ব্বক বহু সৈন্য সংহার করিলেন, এবং অবশিষ্ট সেনাগণকে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে অনুমতি দিয়া আপনি কান্ধার অধিকার করিলেন। এই কর্ম্ম অতি গর্হিত বলিতে হইবে, ইহাতে হোমায়ুনের

বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হইয়াছে। অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন তিনি রাজপুত্রকে নষ্ট করান।

কান্ধার অধিকারের পরে হোমায়ুন কাবুলে যাত্রা করিলেন।* ঐ সময়ে হিন্দাল ও আরং অনেক প্রধান লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিলেন। কামরান যুদ্ধে নিরুৎসাহ হইয়া হোমায়ুনের আগমনে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধু রাজ্যে পলাইলেন। হোমায়ুন অনায়াসে কাবুল অধিকার করিলেন, এবং স্বীয় পুত্র আকবরকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে আকবরের বয়ঃক্রম দুই তিন বৎসর। হোমায়ুন কিছুকাল কাবুলে অবস্থিতি করিয়া বদকস্থান উদ্ধার জন্য গমন করিলেন। ঐ সময়ে কামরান সসৈন্যে আসিয়া কাবুল পুনরধিকার করিলেন, এবং আকবর পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তে পড়িলেন। হোমায়ুন বদকস্তান হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার কাবুল আক্রমণ করিলেন। তখন দুর্গের যে স্থান দিয়া তাঁহার তোপ চলিবে, কামরান দুষ্পোষ্য আকবরকে সেইখানে রাখিয়া দিলেন, মনে২ করিলেন ইহা করিলে হোমায়ুন যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু হোমায়ুন তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। কামরান সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। তাহাতে হোমায়ুন স্বীয় পুত্র ও কাবুল রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

হোমায়ুন নগর পুনরধিকার করিলে কামরান তাঁহার সদনে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হোমায়ুন তাঁ-

হার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে নিকটে রাখিলেন। হিন্দাল ও মির্জা আস্করী ঐ সময়ে তথায় ছিলেন। অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা আস্করীর শৃঙ্খল মোচন করাইয়া চারি ভ্রাতায় একত্র আহার আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। এবং ঐ তিন ভ্রাতা ভবিষ্যতে হোমায়ুনের অপকার করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার লবণ ভক্ষণ করিলেন।

কিন্তু তাহার কিছুকাল পরেই কামরান প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক হোমায়ুনকে কাবুল হইতে তাড়াইলেন।

হিং ৯৬১
খৃ ১৫৫৩

হোমায়ুন পুনর্ব্বার ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন*। তখন কামরান পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় না দেখিয়া গোরক্ষা রাজ্যে গোপন ভাবে থাকিলেন। কিন্তু গোরক্ষারা তাঁহার পরম শত্রু, তাঁহাকে ধরিয়া হোমায়ুনের হস্তে সমর্পণ করিল। হোমায়ুন তাঁহাকে তিন চারি দিবস উত্তম রূপে রাখিলেন. তাহার পর অসৎ আচরণের প্রতিফল জন্য তাঁহার চক্ষু উৎপাটনের আজ্ঞা দিলেন। চক্ষু উৎপাটন কালে কামরান কিছুমাত্র যন্ত্রণা বোধ করিলেন না; কিন্তু যখন তাহাতে লবণ ও নেম্বুর রস প্রক্ষেপ করিতে লাগিল, তখন অত্যন্ত যাতনা বোধ করিয়া বলিলেন হে পরমেশ্বর! আমি যে পাপ করিয়াছি এই পৃথিবীতেই তাহার দণ্ড হইল, ভবিষ্যতে যেন আর এমন যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। এই ব্যাপা-

---

* ইহার মধ্যে হোমায়ুন আরো আর অনেক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে লেখাগেল না।

রের পর হোমায়ুন তাঁহাকে মক্কাতে প্রেরণ করিলেন, কামরান কিছু দিন পরে তথায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

হোমায়ুন এবম্বিধ বিবিধ বিপদ ও যুদ্ধের পর কাবুলে ৯ বৎসর রাজত্ব করিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্জাব অধিকার করিয়া, ৯৬২ অব্দে, দিল্লীর রাজসিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার বৃত্তান্ত পরে লেখা যাইবে, কিন্তু হিজরী ৯৪৭ অব্দে ভারত হইতে তাঁহার পলায়ন অবধি ৯৬২ অব্দে দিল্লী পুনরধিকার পর্য্যন্ত, ১৫ বৎসর দিল্লীর রাজকর্ম্ম কিরূপে চলিয়াছিল তাহা পাঠকেরা জানিতে পারেন নাই, তদ্বিবরণ অগ্রে লেখা যাইতেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সুরবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

সের সাহ।

হিং ৯৪৭
খৃ ১৫৪০
কং ৪৬৪২

হোমায়ুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে পর, সেরসাহ তাঁহার সমুদয় রাজ্য অধিকার করিলেন। সেরসাহ যে প্রকারে ঐ রাজ্য লইলেন তাহাতে অনেকে তাঁহাকে রাজ্যাপহারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা নিতান্ত সঙ্গত বোধ হয় না, কেনন৷ ভারতবর্ষ তৈমুর বংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য নহে, তাঁহারা স্থানান্তর হইতে আসিয়া কেবল ১৪ বৎসর মাত্র এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেরসাহ এই দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, অতএব জন্মভূমি বলিয়া এই দেশে তাঁহার এক প্রকার অধিকার ছিল, বিশেষতঃ যখন অন্য২ মুসলমান রাজারা এই দেশ বলপূর্ব্বক লইতে পারিয়াছেন, তখন তিনিও আধুনিক রাজাদিগের হস্ত হইতে রাজ্য লইবেন তাহার বাধা কি। অতএব এই রাজ্য লওয়াতে তাঁহার অধিক দোষ দৃষ্টি হয় না।

সেরসাহ সম্রাট হইয়া প্রথমতঃ পঞ্জাব রাজ্যের গোলযোগ নিবৃত্তি করিলেন। তৎপরে রোটসের বিখ্যাত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তথায় বিদ্রোহ

শান্তির পর তিনি ঐ দেশ এমন করিয়া বিভাগ করিলেন যে তাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন গোলযোগের সম্ভাবনা রহিল না।

হিং ৯৪৯
খৃ ১৫৪২
সং ১৫৯৯

পর বৎসর তিনি মালব দেশ পুনরধিকার করিলেন। তৎপরে ঐ রাজ্যান্তর্গত রায়সিংহের দুর্গ আক্রমণে নিযুক্ত ইইলেন। এই কেল্লা এক হিন্দু রাজার. তিনি বাহাদুর সাহ রাজার রাজত্ব কালে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। সের সাহ দুর্গ বেষ্টন করিলে সেনাগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া দুর্গ হইতে প্রস্তান করিবার প্রস্তাব করিল, তাহাতে সের সাহ তাহাদিগকে অভয় দান পূর্ব্বক বলিলেন তোমরা প্রস্তান কর, তোমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করিব না। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া চারি সহস্র রজপুত সেনা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া কতকদূরে শিবির সন্নিবেশ করিল। তখন সের সাহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহাদিগের শিবির বেষ্টন করিয়া একেবারে সকলকে সংহার এবং তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। রজপুত সেনাগণ সকলে মরিল বটে, কিন্তু এক এক জন দুই তিন জনকে মারিয়া মরিল। রণক্ষেত্র শবে পরিপূর্ণ হইল। যাহা হউক এই কর্ম্মে সেরসাহের নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হইয়াছে। তৈমুর ভিন্ন আর কোন মুসলমান রাজা এমন বিশ্বাসঘাতকতা কখন করেন নাই।

পর বৎসর সের সাহ ৮০০০০ সৈন্য লইয়া মারওয়ার

দেশ আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে মালদেব তদ্দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রতাপ ছিল। তিনি ৫০০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে সন্নদ্ধ হইলেন। এই অল্প সৈন্য লইয়া তিনি সংগ্রাম জয়ী হইবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ঐ দেশে জল কষ্ট প্রযুক্ত তিনি সাহস করিলেন সেরসাহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। কিন্তু সেরসাহ কৌশলে জয়ী হইলেন। তিনি যুদ্ধ প্রসঙ্গে মালদেবের সেনাপতিগণকে নানা প্রকার লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক পত্র লিখিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে এই সকল পত্র মালদেবের হস্তে পড়ে তাহা করিতে লাগিলেন। এই সকল পত্র মালদেবের হস্তগত হইলে তাঁহার মনে সম্পূর্ণ সন্দেহ জন্মিল, সুতরাং তিনি যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার এক সেনাপতি সের সাহর আচরণে কুপিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন, সেরসাহ ঐ যুদ্ধে একপ্রকার পরাজিত হইয়া আসিলেন।

পর বৎসর সেরসাহ মিবারের অন্তর্গত কালিঞ্জরের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মনে২ ভাবিলেন তদ্দেশীয় রাজাকে কোন কৌশলে বশীভূত করিবেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রায়সিংহে তিনি যে অবিশ্বাসের কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহাতে মিবারাধিপতি তাঁহার কোন কথায় বিশ্বাস করিলেন না, সুতরাং দুর্গ মারিয়া লইবেন ইহা স্থির করিয়া তিনি তোপ চালাইবার উদ্যোগে থাকিলেন। ঐ সময়ে হঠাৎ দুর্গ-

হইতে একটা গোলা আসিয়া তাঁহার বারুদখানায় পড়িল, বারুদ জ্বলিয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হইল। তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকতার এই এক প্রকার শাস্তি, কিন্তু মৃত্যু শয্যাতে শয়ন করিয়াও তিনি দুর্গ লইবার সন্ধান বলিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই দিবসে দুর্গ অধিকার হইল। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি অতি আহ্লাদে, পরমেশ্বর ধন্য, এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

হিং ৯৫২
খৃ ১৫৪৫। মে।

সের সাহ অতি ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন, সামান্য মনুষ্য হইয়া তিনি স্বকীয় বুদ্ধিবলে দিল্লীর রাজ্য অধিকার করিলেন ইহা সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। অনেক রাজ্য ঐশ্বর্য্য করিব ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি পক্ষে সদসৎ বিবেচনা কিছুই করিতেন না, যে প্রকারে হউক কর্ম্ম সিদ্ধি হইলেই হইল। এইজন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধির জন্য রাজাদিগের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়া থাকুন, প্রজার প্রতি তিনি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। প্রজার সুখ ও সচ্ছন্দতার জন্য তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন সকলই উত্তম। অনেক অনেক রাজা অনেক কাল রাজত্ব করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। সেরসাহ পাঁচ বৎসর মাত্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সকল রাজ্য শাসিত এবং বিচারাদির অনেক সুনিয়ম করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত এক রাজপথ

প্রস্তুত করেন, তাহাতে দেশের অনেক মঙ্গল হইয়াছে। এই রাজপথের দুইপার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত হইয়াছিল, তাহার ছায়াতে পথিকেরা সুখে গমনাগমন করিতেন, এবং স্থানে২ পথিকপান্থ ও পর্ণশালা নির্ম্মিত ছিল, তাহাতে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত থাকিত, দীন হীন ব্যক্তিরা বিনা মূল্যে আহার পাইত। তদ্ভিন্ন এই রাজপথের এক এক ক্রোশ অন্তরে এক এক কূপ এবং স্থানে২ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মুসলমান দিগের পর্ম্ম কর্ম্ম হইত। সের সাহের আর এক প্রধান কর্ম্ম এই তিনি সর্ব্বত্র অশ্বের ডাক বসাইয়া ছিলেন, তদ্দ্বারা সংবাদাদি শীঘ্র২ পাইতেন। অধিকন্তু তিনি দস্যুবৃত্তি অতি সুন্দর রূপে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে পথিক বা মহাজনেরা রাজপথে অকুতোভয়ে দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিয়া নিদ্রা যাইত, কেহ ঐ সকল দ্রব্য স্পর্শও করিত না।

সের সাহের মৃত দেহ বেহারের অন্তঃপাতি সসরামে নিখাত হইয়াছিল। ঐ স্থানে তাঁহার গোরস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা অতি অপূর্ব্ব, তাহার চারিদিকে একটী পরম রমণীয় ঝিল আছে, ঐ ঝিল চতুর্দ্দিকে প্রায় এক ক্রোশ, গোরস্থানের শোভার জন্য খনিত হইয়াছিল।

সলীম সাহ স্থর।

সের সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খাঁ নিতান্ত হীনবীর্য্য ছিলেন। এজন্য তিনি আপনাকে রাজকর্ম্মে অক্ষম

হিং ৯৫২
খৃ ১৫৪৫
কং ৪৬৪৭

জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা জলাল খাঁকে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক কেবল বায়না প্রদেশ আপনি রাখিলেন। জলাল খাঁ রাজ্য পাইয়া অঙ্গীকার করিলেন ভ্রাতার প্রতি কোন অত্যাচার করিবেন না, তজ্জন্য রাজ্যের চারি জন প্রধান লোক তাঁহার প্রতিভূ হইলেন। কিন্তু জলাল খাঁ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই সলীম নাম ধারণ পূর্ব্বক মহা ধূম ধাম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে এমন অনুমান হইল তিনি অঙ্গীকার পালন করিবেন না, অতএব ঐ প্রধানেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। জলাল খাঁ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন।

এই ব্যাপারের পর সলীমের রাজত্ব কালে আর কোন সংগ্রামাদি উপস্থিত হয় নাই, তাহাতে তিনি নয় বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মধ্যে একবার জনরব হইয়াছিল হোমায়ুন ভারতবর্ষ লইবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছেন। সলীম এই সময়ে রণসজ্জা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকে দেখিতে না পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজ্যের শোভা বর্দ্ধনে পিতার ন্যায় সলীমের যথেষ্ট

অনুরাগ ছিল। দিল্লীর রাজালয়ের যে অংশ সলীমগড় নামে খ্যাত তাহা তিনি নির্ম্মাণ করেন।

মহম্মদ সাহ্ সুর আদিলী।

সলীমের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা মহম্মদ খাঁ, দ্বাদশ-বৎসর-বয়স্ক তাঁহার এক পুত্রকে বধ করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হইলেন।

(হিং ৯৬০ খৃ ১৫৫৩ সং ১৬১০)

মহম্মদ নীচসহবাসী, মূর্খ, এবং অতি লম্পট ছিলেন। সুতরাং তিনি সর্ব্ব সাধারণের অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেন। হেমু নামে এক হিন্দু দোকানদারী করিয়া দিনপাত করিতেন, তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ঐ ব্যক্তির যেমন ব্যবসায় আকারও তদ্রূপ, কিন্তু তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধি ভাল ছিল, তাহাতে তিনি যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন সকল কর্ম্মই উত্তম রূপে সম্পাদন করিয়া ছিলেন।

মহম্মদ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অপব্যয় আরম্ভ করিলেন, তাহাতে রাজভাণ্ডার শীঘ্র শূন্য হইয়া পড়িল। তখন অপব্যয় ও কুসহবাসী দিগকে ধনবান্ করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া তিনি রাজ্যের প্রধান ২ লোকদিগের বৃত্তিচ্ছেদ ও ভূম্যাদি হরণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। এব্রাহেম সুর নামে তাঁহার পরিবারস্থ এক ব্যক্তি দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

করিলেন। সেকন্দর সুর নামে আর এক জ্ঞাতি পঞ্জাব রাজ্য লইলেন। বঙ্গ দেশের রাজাও রাজপ্রভুত্ব অমান্য করিলেন, এবং মালবাধিকারী স্বাধীন হইয়া বসিলেন। এই প্রকার চারি দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। হেমু বঙ্গদেশের উপদ্রব শান্তির জন্য তদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিতে করিতেই শুনিলেন হোমায়ুন সেকন্দরকে পরাজয় করিয়া আগ্রা ও দিল্লী পুনরধিকার করিয়াছেন।

হোমায়ুনের দ্বিতীয়বার রাজত্ব।

হোমায়ুন যৎকালে কাবুলে রাজত্ব করেন তখন একবার কাশ্মীর আসিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সলীম সাহ অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া ক্ষান্ত হয়েন। তদনন্তর সলীম সাহের মৃত্যুর পর, মহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে, এব্রাহেম দিল্লী রাজ্য অধিকার করিলে, পঞ্জাবেশ্বর সেকন্দর, তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। মহম্মদও স্বীয় রাজ্য উদ্ধারের জন্য সেকন্দর ও এব্রাহেম উভয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সুযোগে হোমায়ুন ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পঞ্জাবদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সেকন্দরের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। সেকন্দর এই সংবাদ পাইয়া

বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সবহন্দে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া হিমালয় শিখরে পলায়ন করিলেন। তাহাতে হোমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা

হিং ৯৬৩
খৃ ১৫৫৫
কং ৪৬৫৭

রাজ্য অধিকার করিলেন। সেকন্দর পুনর্ব্বার সমর সজ্জায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু হোমায়ুনের সেনাপতি বহরাম তাঁহাকে পরাভব করিলেন। এই সংগ্রামে যুবরাজ আকবরও উপস্থিত ছিলেন, তিনি তখন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় বালক, তথাপি এমন বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে তাহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল।

হোমায়ুন দিল্লী রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তখন ঐ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। যাহাহউক তাহা পাইয়াও তিনি বহুকাল ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ, এক দিবস অপরাহ্নে পুস্তকালয়ের ছাতের উপর পাদ বিহার করিতেছিলেন, সন্ধ্যাকালে যেমন নামিয়া আসিবেন অকস্মাৎ পৈঠাতে পা পিছলিয়া একেবারে ভূমিতে পড়িলেন, ইহাতে তাঁহার মস্তক ও শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিল, তাহা কিছুতেই সারিল না, পতনের চারি দিবস পরে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

হোমায়ুন অতি সৎস্বভাব ছিলেন। তিনি দিল্লী রাজ্যের অধিপতি হইয়া যে প্রকার ক্লেশ সহ করিয়াছিলেন তাহা প্রায় অন্য কোন রাজা করেন নাই। কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহার শরীরে যেমন দয়া ছিল পরে তদ্রূপ ছিলনা। তাহার

কারণ, সর্ব্বদা শত্রুজালে বেষ্টিত, শত্রুর সহিত সদ্ব্যবহার করিলে রাজ্যরক্ষা কঠিন। অতএব দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া দয়া বর্জ্জিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে সত্তের মধ্যেই গণ্য করিতে হয়। হোমায়ুন ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন। ইহার মধ্যে ১৬ বৎসর দেশত্যাগী, এবং ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। হোমায়ুনের মৃত্যুকালে যুবরাজ আকবর পঞ্জাবে ছিলেন। হেমু বঙ্গদেশ পুনর্জ্জয় করিয়া যখন শুনিলেন হোমায়ুন পরলোক গমন করিয়াছেন, তখন মহা আস্ফালন পূর্ব্বক আগ্রাতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে অসংখ্য লোক তাঁহার সঙ্গে মিলিল। তাহাতে তিনি অনায়াসে আগ্রা রাজধানী পুনরধিকার করিলেন। তৎপরে দিল্লী হইতে মোগলকুল নির্ব্বাসন করিয়া দিলেন।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া আকবরের মন্ত্রিগণের মনে মহাত্রাস জন্মিল। তাঁহারা দিল্লী রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রত্যাগমনের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হোমায়ুনের বিশ্বাসী সেনাপতি আকবরের কর্ম্মকর্ত্তা বহরাম ঐ পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া হেমুর সহিত পানিপতে যুদ্ধ করিলেন। হেমু যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অবশেষে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মাতঙ্গপৃষ্ঠে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন বহরাম তাঁহাকে রণবন্দী করিয়া আকবরের সম্মুখে দিয়া

বলিলেন এই তোমার পরম শত্রু, ইহাকে বিনাশ কর। মড়ার উপর খড়্গাঘাত করা কাপুরুষের কর্ম্ম এই বিবেচনা করিয়া যুবা আকবর তাহা করিলেন না। বহরাম আপনি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহাতে মহম্মদ সাহ চিরকালের জন্য রাজ্য আশায় বঞ্চিত এবং ভুবনবিখ্যাত আকবর দিল্লীর সম্রাট হইলেন।

হিং ৯৬৩
খৃ ১৫৫৬
কং ৪৬৫৮

হিন্দু স্বাধীন রাজ্যের বিবরণ।

এই ভারতবর্ষে পাঠানেরা যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিলেন মহম্মদ তোগল্লকের রাজত্ব কাল অবধি তাহা ক্রমে২ অনেক স্বাধীন হইয়াছিল। তৈমুর গোষ্ঠীয় রাজারা তাহা পুনরধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা একেবারে হয় নাই, বহুকালে হইয়াছিল। অতএব আকবরের সিংহাসনারোহণ কালে এই রাজ্যের কি অবস্থা ছিল তদ্বিষয়ে কোন ভ্রম না জন্মে এজন্য তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে।

যখন মহম্মদ তোগল্লক রাজা হইলেন তখন উত্তরে হিমালয় অবধি পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে দেশ পাঠান দিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। কেবল রজঃপুত রাজাদিগের রাজ্য ও উৎকল প্রদেশ আয়ত্ত হয় নাই, এই সকল দেশে তদ্দেশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন।

তদনন্তর বঙ্গদেশের রাজা প্রথমতঃ দিল্লীশ্বরের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইলে, ক্রমে অন্যান্য স্থানেও ঐ বাতাস উঠিল। তৈলঙ্গ ও কর্ণাটের হিন্দু রাজারা ঐ দুই রাজ্য উদ্ধার করিয়া, হায়দ্রাবাদে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের যে২ রাজ্য ছিল তাহা অধিকার করিলেন, এবং উত্তরে অরঙ্গল ও দক্ষিণে বিজয় নগর স্থাপন করিলেন। তাহার পর দক্ষিণ দেশে যে সকল মুসলমানেরা ছিলেন তাঁহারা রাজদ্রোহী হইয়া নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সকল রাজ্য অধিকার করিলেন। নর্ম্মদার দক্ষিণে দিল্লীশ্বরের কোন প্রভুত্ব রহিল না।

মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর সময় পাঠানদিগের রাজ্যের অবস্থা এই প্রকার ছিল। যখন তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখনও তাঁহাদিগের রাজ্য তদবস্থায় ছিল। তৎপরে মালব ও গুজরাটের রাজারা স্বাধীন হইয়া বসিলেন। তদ্ভিন্ন জোয়ানপুর নামে আর এক নূতন রাজ্য স্থাপিত হইল, গঙ্গার উত্তর অযোধ্যা পর্য্যন্ত তাহার সীমা। তৈমুরলঙ্গ স্বদেশে প্রস্থান করিলে আর২ সকল রাজ্য একে একে রাজপ্রভুত্ব অমান্য করিতে লাগিল, সুতরাং দিল্লী রাজ্যের সীমা কেবল ঐ নগরের কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিল। তদ্ভিন্ন অন্য স্থানে দিল্লীশ্বরের কোন ক্ষমতা রহিল না।

দক্ষিণ দেশে হোসন গঙ্গু নামে এক ব্রাহ্মণ যে রাজ্য স্থাপন করেন তাহা তাঁহার সন্তানেরা ১৭০ বৎসর পর্য্যন্ত

ভোগ করেন। এই রাজারা অরঙ্গল ও বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদিগের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে অরঙ্গলনগর একেবারে ধ্বংস, এবং বিজয়নগরের অন্তঃপাতি কৃষ্ণা ও তুম্বুদ্রা নদীর মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় দেশ তাঁহাদিগের অধিকার ভুক্ত হয়। অবশেষে এই রাজ্যে ধর্ম্মবিরোধ উপস্থিত হইল। তাহার কারণ, ঐ দেশে মোগল, পাঠান, তুর্কী, পারসী ও অন্যান্য জাতীয় অনেক মুসলমানেরা বাস করিত, ইহাদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি দুই মতাবলম্বী লোক ছিল। পারস দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলে সিয়া, আরব জাতীয়েরা অধিকাংশ সুন্নি। ঐ সকল লোকের ঔরসজাত তদ্দেশীয় যে সকল মনুষ্য ঐ দেশে সৈন্যের কর্ম্ম করিত তাহারা সকলে সুন্নি মতাবলম্বী, সিয়া মতাবলম্বী দিগের সহিত তাহাদের সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত। যে পর্য্যন্ত রাজারা সবল ছিলেন সেপর্য্যন্ত এই সকল বিবাদে রাজ্যের কোন বিঘ্ন হয় নাই। কিন্তু যখন রাজাদিগের বলহ্রাস হইতে লাগিল, তখন ইউসফ্ আদিল খাঁ নামে সিয়া মতাবলম্বী এক জন তুর্কী বিপক্ষ দলকে প্রবল দেখিয়া, স্বীয় দলবল লইয়া আপনি বিজয়পুরে যাইয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন। ঐ রাজ্যে তাঁহার বংশীয়েরা রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে কাসীম বারীদ নামে এক জন তুর্কী অপর দলাধিপতি নিজামউলমুলককে হত্যা করিল, তাহাতে ঐ দলপতির পুত্র আহম্মদ রাজদ্রোহী হইয়া

আপনি আর এক রাজ্য স্থাপন করিলেন, তাহার রাজধানীর নাম আহমদ নগর হইল।

নিজামউলমুলকের মৃত্যুর পর কাশীম বারীদের অতুল পরাক্রম হইল, তাহাতে তিনি রাজাদিগকে প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ রাখিয়া আপনি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমীর বারীদ পিতার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু পরকীয় কার্য্যে সন্তোষ বোধ না করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব এই বাসনায় তিনি বামন রাজ্য ধ্বংস করিয়া আপনি বিদরে আর এক রাজ্য স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানে তদ্বংশীয় বারীদেরা রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইহা ভিন্ন কথকলী নামে আর এক জন তুর্কী গোলকন্দাতে আর এক রাজধানী করিলেন, এবং ইমানউলমুলক নামে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এক হিন্দু বেরারের মধ্যে ইলিচপুরে আর এক রাজ্য স্থাপন করিলেন।

এই প্রকার অনেক নূতন রাজ্য হইল। নব্য রাজারা পরস্পর এবং নিকটস্থ হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া বিজয়নগরের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণানদীর তীরে তালিকোটের নিকট এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ঐ যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজার সকল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন, তিনি আপনি রণবন্দী ও হত এবং তাঁহার রাজ্য একেবারে ধ্বংস হইল।

হিং ৯৭৩ }
খৃঃ ১৫৬৫ }

কিন্তু যে সকল রাজারা পাকচক্র করিয়া তাঁহার রাজ্য নষ্ট করিলেন তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইল না। বিজয়নগর ভঙ্গ হইয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য হইল। এবং গোলকন্দার রাজারা অরঙ্গল ও কর্ণাট জয় করিয়া পানার নদী পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিলেন।

গুজরাট রাজ্য বড় বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু এ দেশস্থ রাজারা মালব রাজ্য জয় করিয়া ঐ দেশ আপনাদের অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। এবং রজঃপুত্রদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধে পরাভব করিতেন। তদ্ভিন্ন খান্দেশে তাঁহাদিগের আধিপত্য চলিয়াছিল, এবং বেরার ও আহম্মদ নগরের রাজারা তাঁহাদিগের আজ্ঞাকারী ছিলেন। অধিকন্তু এই রাজারা পোর্ত্তুগিষ লোকদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা সমুদ্রযুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সকল কারণ প্রযুক্ত দক্ষিণ প্রদেশে মুসলমানদিগের যত রাজ্য ছিল তন্মধ্যে গুজরাটকে প্রধান বলাযাইতে পারে। বঙ্গদেশ গুজরাট হইতে আরো বিস্তৃত ও ধনাঢ্য বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্ত বীর্য্যহীন, তাহাতে এই দেশ গুজরাটের ন্যায় খ্যাত্যাপন্ন হইতে পারে নাই।

দক্ষিণ দেশ ভিন্ন আর২ যে সকল হিন্দুরাজ্য তৎকালে ছিল এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, রজঃপুত জাতীয়েরা তাহার রাজা। এই রজঃপুতেরা ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব এবং অত্যন্ত বীর্য্যবান। মুসলমান রাজারা যে সকল রজঃপুত-রাজ্য পরাজয় করিয়াছিলেন তত্রস্থ রজঃপুতেরা অন্যান্য

লোকের ন্যায় কৃষি কর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিত। কিন্তু সিন্ধু ও যমুনার মধ্যস্থ বিন্ধ্য গিরির উত্তরে দিল্লীর রেখা পর্য্যন্ত রজঃপুতদিগের যে সকল রাজ্য ছিল তাহাতে মুসলমানেরা দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই। তজ্জন্য রাজারা স্বাধীন ভাবে ছিলেন। এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে মরুভূম ও আরাবলী পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্ব উত্তরে মেওয়াত, জয়পুর, আজমীর, হারাবতী, মিবার, বুন্দেলখণ্ড, মালব, এই কয়েক প্রদেশ আছে। তন্মধ্যে মিবার প্রদেশে জয়পুর, আজমীর, উদয়পুর, ও চিতোরের দুর্গ; মালবে উজ্জয়িনী, ও ভূপালের দুর্গ; এবং বুন্দেলখণ্ডে কালিঞ্জরের দুর্গ। ইত্যতিরিক্ত বিন্ধ্যায় গোয়ালিয়র ও আর২ অনেক দুর্গ আছে তাহা অতি চমৎকার ও দৃঢ়। আরাবলীর পশ্চিম যে রজঃপুতরাজ্য তাহার নাম মারওয়াড়, তন্মধ্যে যোধপুর যশলমীর ভিকানির প্রভৃতি কয়েক স্থান আছে। এই সকল স্থান বালুকারণ্যের মধ্যে। বালকাতে এই সকল দেশকে রক্ষা করে, অর্থাৎ বালুকার ভয়ে ঐ অঞ্চলে প্রায় লোকের গতিবিধি হয় না, তাহাতে ঐ স্থানবাসী লোকদিগের শত্রুশঙ্কা প্রায় ছিল না। সুতরাং মুসলমানেরা ঐ সকল দেশ জয় করিতে পারেন নাই আরাবলীর পূর্ব্বে যে সকল দেশ ছিল তাহাতে মুসলমানদিগের গমনাগমন হইত তজ্জন্য রাজারা কখন পরাজিত কখন করাধীন হইতেন, কিন্তু আকবরের রাজত্ব কালে ইহারা সকলে স্বাধীন ছিলেন।

আকবরের রাজ্যারম্ভ কালে মুসলমান রাজ্যের এই অবস্থা ছিল। আকবর রাজা হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজা পালনের যে সকল সুনিয়ম করিয়াছিলেন তাহা পরে প্রকাশ হইবে। তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহাই সম্প্রতি লেখা যাইতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আকবর।

হিং ৯৬৩
খৃ ১৫৫৬
কং ৪৬৫৮

যখন আকবর সিংহাসনারোহণ করিলেন তখন তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম। এই নবীন বয়সে তাঁহার সাহস ও বিচক্ষণতার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না, তথাপি হোমায়ুনের আজ্ঞা ছিল তিনি যেপর্য্যন্ত বয়ঃ প্রাপ্ত না হইবেন সেপর্য্যন্ত বহরাম খাঁ রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই রাজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।

বহরামের জন্মস্থান তুর্কস্থান। তিনি যৌবন কালাবধি হোমায়ুনের সঙ্গে২ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং আকবরেরও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ও কর্কশভাষী, এবং সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতেন, ইহাতে প্রধান পক্ষ তাবৎ লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। অধিকন্তু, তার্দীবেগ নামে হোমায়ুনের অতি বিশ্বাসী এক সৈন্যাধ্যক্ষ দিল্লীনগরের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন, হেমু যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এই অপরাধে তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড

করিলেন, আকবরকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। আর এক জন প্রধান লোক তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাঁহাকেও তিনি খড়্গমুখে অর্পণ করিলেন। ইহাভিন্ন রাজগুরু পীর মহম্মদেরও প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি মক্কা গমন করিয়া কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেন।

বহরামের এই সকল কর্ম্ম দেখিয়া প্রধানপক্ষ সকলের মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। আকবরও দেখিলেন বহরাম তাঁহাকে প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় রাখিয়া আপনি সকল কর্ত্তৃত্ব করিতেচাহেন। অতএব কতকগুলিন আত্মীয় লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া এক দিন মৃগয়াস্থলে বহির্গত হইয়া, গর্ব্ভধারিণীর পীড়া হইয়াছে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি, এই কথা বলিয়া তিনি দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর এক ঘোষণা দিলেন তিনি স্বয়ং রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, অতএব যাহার যে প্রার্থনা থাকে তাঁহাকে জানাইবে; আর কাহাকে জানাইবে না।

এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলে বহরামের চক্ষু বিকসিত হইল। তিনি দেখিলেন আকবর তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন। বহরাম পুনর্ব্বার রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল, আকবর তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন না। বহরাম প্রথমতঃ মনে করিলেন আকবর যেমন অবাধ্য হইলেন আমি বলপূর্ব্বক মালবপ্রদেশ অধিকার করিয়া স্বাধীন হই। কিন্তু পরে

বিবেচনা করিয়া দেখিলেন সে কর্ম্ম উচিত নহে। অতএব সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া নগরে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে গুজরাট দিয়া মক্কায় যাত্রা করিবেন এই চিন্তা করিতেছেন এমন সময় আকবর তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পত্র লিখিলেন তুমি মক্কা গমন কর। বহরাম এই আজ্ঞা পাইয়া, নিসান ডঙ্কা প্রভৃতি মর্য্যাদার যে যে দ্রব্যাদি তাঁহার স্থানে ছিল তাহা রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া গুজরাট যাত্রা করিলেন।

গুজরাটে উপস্থিত হইয়া বহরামের কেমন কুমতি হইল তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক পঞ্জাব রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিলেন। আকবর অযৌগে তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। বহরাম তখন তাঁহার পদানত হইয়া নানা প্রকার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। আকবর যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার দক্ষিণ ভাগে বসাইলেন। তাহার পর সম্ভ্রম সূচক পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ, যদি রাজ্যসুখের বাঞ্ছা হয় বল তোমাকে কোন বৃহৎ রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিতেছি, যদি তাহা মনোগত না হয়, তবে আমার সভায় কোন সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম গ্রহণ কর। অথবা তীর্থগমনের অভিলাষ হইয়াথাকে তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তুমি মক্কা গমন কর। অহঙ্কার বা সদ্বিবেচনা প্রযুক্তই হউক বহরাম রাজ্যাভিলাষ না করিয়া মক্কাগমনের বাসনা

জানাইলেন। তাহাতে আকবর তাঁহার গমন ও ভরণ পোষণের নিমিত্ত যথোচিত বৃত্তি নিয়োজিত করিয়া দিলেন। তদনন্তর বহরাম গুজরাটে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ঐ স্থান হইতে যেমন জাহাজারোহণ করিবেন ঐ সময়ে একজন পাঠান তাঁহাকে বধ করিল। বহরাম ঐ ব্যক্তির পিতাকে যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন সেই আক্রোশে ঐ ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিল।

তদনন্তর অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে, আকবর সমস্ত রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তৎকালে রাজ্যে কেমন গোলযোগ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না, বিচার ও রাজকর্ম্মের কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। ভিন্ন ২ স্থানে যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা নিতান্ত অবাধ্য এবং নিয়ত যুদ্ধ দ্বন্দ্বে মত্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিয়া প্রজাপালন ও ব্যবস্থাদি সংশোধন, ও অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করা বড় সহজ কর্ম্ম নহে; বিশেষতঃ তাঁহার আয় অধিক ছিল না, কেবল পঞ্জাব দিল্লী ও আগ্রার রাজস্বের উপর নির্ভর। অধিকন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সকল সৈনা আসিয়াছিল তাহারা একস্থানের লোক নহে, ভিন্ন ২ স্থান হইতে লোভানুরোধে আসিয়াছিল, রাজার নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী ছিল না। ইহাতে সকল দিক রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করা কেমন কঠিন তাহা বলিবার অপেক্ষা করে না। কিন্তু আকবর সামান্য মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি চতুরতা ও অতি অসাধারণ ক্ষমতা

ছিল, তাহাতেই তিনি সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়েন। অন্য কোন ব্যক্তি হইলে সে রূপ কদাচ হইত না।

যে বৎসর আকবর আপন হস্তে রাজ্যভার লইলেন, সেই বৎসর সুলতান মহম্মদের এক পুত্র বহু সঙ্খ্যক সৈনা একত্র করিয়া জুয়ান পুরে রাজবিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন। আকবর ঐ বিদ্রোহ দমন জন্য এক সেনাপতি প্রেরণ করিলেন, ঐ সেনাপতি মহম্মদকে পরাজয় করিলেন। কিন্তু অনেক লুণ্ঠিত ধন প্রাপ্ত হইয়া রাজার প্রাপ্য অংশে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। আকবর ঐ সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সসৈন্যে যাইয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তদনন্তর বাজবাহাদুর নামে মালবের কর্ম্মকর্ত্তা রাজদ্রোহী হইলেন। আদম খাঁ নামে আকবরের এক সৈন্যাধ্যক্ষ তথায় যাইয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু তাহার পর আপনি অস্ত্রধারী হইবার উপক্রম করিলেন, আকবর তাহা শুনিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ঐ সেনাপতি আর কোন উপদ্রব করিতে পারিলেন না।

হিং ৯৬৮ }
খৃ ১৫৬০ }

আকবর সকল কর্ম্মের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এবং নিয়ম পালনের প্রতি বিশেষ কটাক্ষ রাখিতেন, নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে কাহাকেও ক্ষমা করিতেন না। ইহাতে উজবক জাতীয় সেনাপতিগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তাহাদিগের প্রতি তাঁহার পিতামহ ও পিতার নিতান্ত দ্বেষ

হিং ৯৭২ }
খৃ ১৫৬৪ }

ছিল, কি জানি সেই দ্বেষ প্রযুক্ত তিনি যদি তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করেন এই আশঙ্কায় তাহারা সকলে অস্ত্র ধারণ করিল। আর২ অনেক প্রধান লোকও তাহাদের সহিত মিলিল। ঐ সময়ে নর্ম্মদার তীরে গরা নামে এক স্থানে এক হিন্দু পরাক্রমশালিনী রাণী ছিলেন। আক- বর তাঁহার দমন জন্য আসফ খাঁ নামে একজন সেনা- পতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আসফ খাঁ উপস্থিত হইলে ঐ রাণী স্বয়ং সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার সেনাসকল পলায়ন করিল, এবং তিনি আপনি আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে নিরুপায় হইয়া অপমানের ভয়ে স্বয়ং বক্ষোদেশে খড়্গাঘাতপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। রাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আসফের হস্তে পড়িল। আসফ তাহার লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া উজবকদিগের সহিত মিলিলেন।

এই প্রকার চতুর্দ্দিগে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। আকবর দুই বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাহার শান্তি করিলেন। তদ- নন্তর, হাকিম নামে তাঁহার যে ভ্রাতা কাবুলে রাজা হইয়া- ছিলেন তিনি পঞ্জাব রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তাহাতে আকবর স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। ঐ সময় এতদ্দেশীয় শত্রুগণ পুনঃ একত্র হইয়া রাজা হইবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। আকবর পঞ্জাব হইতে আসিয়া তাহাদিগকে এমত শাস্তি দিলেন যে তাহাতে তাহারা একেবারে

গঙ্গাপার পলায়ন করিল। আকবর তাহাদের পশ্চাৎ২ গঙ্গাপর্য্যন্ত আসিলেন। বিদ্রোহীরা মনে করিল বর্ষারম্ভ হইয়া নদী অতি বেগবতী হইয়াছে, বর্ষা শেষ না হইলে আকবর নদী পার হইতে পারিবেনা। কিন্তু তিনি তাহার অপেক্ষা না করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার পর দুই সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে, সন্তরণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়া, গোপন ভাবে থাকিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র অকস্মাৎ বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। ঐ আক্রমণে শত্রুগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে যেদিগে পাইল সেই দিগে পলায়ন করিল।

এইপ্রকারে আকবর সকল অবাধ্য প্রধানদিগকে বশীভূত করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর

হিঃ ৯৭৫ }
খৃ ১৫৬৭।৮ }

মাত্র। তৎপরে তিনি রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ করিয়া, প্রথমতঃ মারওয়ার অন্তর্গত মির্তার দুর্গ জয় করিলেন। পরে চিতোরের রাজা উদয়সিংহের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। উদয়সিংহ সঙ্গার পুত্র, তিনি শান্তস্বভাব ছিলেন, অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া জয়মল্ল নামে এক মহাবল সেনাপতির হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া আপনি গুজরাটে পলায়ন করিলেন। আকবর স্থির করিলেন বারুদ দ্বারা প্রাচীর ভেদ করিয়া দুর্গ প্রবেশ করিবেন, এনিমিত্ত প্রাচীরের নীচে দুই স্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া তন্মধ্যে বারুদ পুরিয়া একেবারে দুইস্থানে অগ্নি দেওয়াইলেন। কিন্তু একস্থানের

বারুদ ধরিয়া কতকটা প্রাচীর ভগ্ন হইল, দ্বিতীয় স্থানে অগ্নি ধরিল না, ইহা দেখিয়া সেনাগণ ভগ্নস্থান দিয়া প্রাচীর আরোহণ করিতেলাগিল। ইতি মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের বারুদ হঠাৎ প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার অনেক সেনা হত ও আহত হইল। যাহাহউক সেই ঘটনার পর দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকাই সংকল্প বিবেচনা করিয়া, দুর্গের চতুর্দ্দিগে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।

তদনন্তর আকবর এক দিবস রাত্রিকালে উঠিয়া দেখিলেন অনেক রাজমজুর মসাল জ্বালাইয়া ভগ্ন প্রাচীর পুনঃ সৌষ্টব করিতেছে, এবং জয়মল্ল তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া কোথায় কি করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। এতদবলোকনে আকবর লক্ষ্য শুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে এমত গুলি মারিলেন যে তাহাতে তিনি সেইখানেই শয়ন করিয়া মহানিদ্রাপ্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনাতে দুর্গরক্ষক সেনাগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া দুর্গের যাবতীয় নারীগণকে জয়মল্লের জ্বলন্ত চিতাতে নিক্ষেপ করিল, পরে আপনারা দেবমন্দির আশ্রয় করিয়া থাকিল, দুর্গরক্ষার কোন যত্ন করিলনা। আকবর দুর্গ প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ দূর হইতে আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহার পর তিন শত রণমাতঙ্গ দুর্গের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন, ঐ সকল মাতঙ্গ পতঙ্গের ন্যায় কাহাকে চরণে মর্দ্দন কাহাকে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া সংহার করিতে লাগিল। এই

হিং ৯৭৫
খৃ ১৫৬৮ মার্চ

এপ্রকার ৮০০০ লোক একবারে হত হইল। আকবর তাহার পরে সচ্ছন্দে দুর্গ অধিকার করিলেন।

উদয়সিংহ বহু দিবস পলাইয়া থাকিলেন। পরে তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ অনেক যুদ্ধাদি করিয়া পৈতৃক রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি উদয়পুর নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ স্থানে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন।

পর বৎসর আকবর রিন্তাম্বর ও কালিঞ্জরের দুর্গ জয় করিলেন। তৎপরে আর২ অনেক রজঃপুত রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যুদ্ধ না করিয়াও তিনি কৌশলে অনেক রাজাকে বশীভূত করিলেন। তাহার কারণ, তিনি জয়পুরের রাজা বহরমল্লের কন্যাকে বিবাহ করিলেন, তদনন্তর মারওয়ার রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, জয়পুরের রাজপরিবারস্থ এক কন্যার সহিত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিলেন। ইহাতে অনেক হিন্দু রাজার সঙ্গে কুটুম্বিতা আরম্ভ হইল, এবং হিন্দুভার্য্যাদিগের গর্ব্ভজাত সন্তানেরা, মুসলমান স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তানের ন্যায়, পিতার বিষয়ের অধিকারী হইতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে রাজ্যের প্রধান২ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। সুতরাং অনেক রজঃপুত রাজা জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক রাজকুটুম্বি-

ভার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অনুগত হইতে লাগিলেন। আকবর অনেক রাজাকে এই প্রকার বশীভূত করিলেন, অধিক যুদ্ধ করিতে হইল না।

আকবরের পরেও আর কয়েক জন রাজা এই ধারাতে চলিয়াছিলেন, এবং হিন্দুরাজারা মুসলমানদিগকে দুহিতা দান করিতেন। কেবল উদয়পুরের রাজা জাত্যভিমান প্রযুক্ত একপ কুটুম্বিতা করেন নাই, বরং যে সকল রজঃপুত রাজারা আকবরের পরিবারে কন্যাদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিয়াছিলেন।

এবম্বিধ উপায় দ্বারা অনেক রাজাকে করস্থ করিয়া আকবর গুজরাট জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন, গুজরাট রাজ্য ইতিপূর্ব্বে স্বাধীন হইয়াছিল। গুজরাটাধিপতি বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে এতমাদ খাঁ নামে তাঁহার এক হিন্দু ক্রীত দাস তাঁহার পুত্র বলিয়া মজাফর নামধারী এক বালককে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া আপনি রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেকে তাঁহার প্রতিবাদী হইল, বিশেষতঃ জঙ্গিশ খাঁ নামে এক প্রধান লোক তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। (এই সংগ্রাম ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিল)। এতমাদ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া আকবরের সহায়তা প্রার্থনা

করিলেন, আকবর অতি আগ্রহ পূর্ব্বক গুজরাটে যাত্রা করিলেন। তিনি পৈতানে উপনীত হইলে, মজাফর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায় রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আকবর ঐ রাজ্যের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবাধ্য প্রধান দিগকে অস্ত্রবলে বাধ্য করিলেন। তৎপরে সমুদ্রতটে সৌরাষ্ট্র নগর আক্রমণ করিলেন। এই নগরে অনেক বিদ্রোহী একত্র হইয়াছিল, তাঁহার আগমনে তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিল। এই সকল বিদ্রোহী অন্যান্য বিদ্রোহীর সঙ্গে মিলিয়া দলবদ্ধ না হয় এজন্য আকবর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক দিবস কেবল ১৫৮ জন সৈন্য লইয়া তিনি এক সহস্র লোকের সম্মুখে পড়িলেন, ইহাতে ভীত না হইয়া তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এ কর্ম্ম অতি দুঃসাহস বলিতে হইবে, যেহেতু ইহাতে প্রাণ যাইবার আটক ছিলনা। তথাপি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হইয়া তিনি একটা সুড়ি পথ আশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীগণ তাঁহাকে পরাজয় করিতে না পারিয়া আপনারা পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর আকবর সৌরাষ্ট্র নগর অধিকার করিলেন। তাহাতে তাবৎ গুজরাট প্রদেশ তাঁহার প্রভুত্বাধীন হইল।

এই ঘটনার পর আকবর আগ্রাতে প্রত্যাগমন করি-

লেন। কিন্তু একমাস অতীত না হইতেই শুনিলেন হোসন মির্জ্জা নামে এক অবাধ্যপ্রধান গুজরাটে আসিয়া আহম্মাদবাদে তৎপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। যখন আকবর এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন তখন ঘোর বর্ষা, অতএব, অনেক সৈনা প্রেরণ করিতে না পারিয়া, কেবল দুই সহস্র রণদক্ষ অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। ইহারা ঐস্থানে উপস্থিত না হইতে হইতে তিনি স্বয়ং তিন শত ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে উষ্ট্রারোহণে, এক এক দিবস চল্লিশ চল্লিশ ক্রোশ পথ গমন করিয়া, অচিরাৎ তথায় উপনীত হইলেন। পরে ঐস্থানে আর এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্বসাকল্যে ৩০০০ সৈন্য লইয়া, আহম্মদাবাদে যাত্রা করিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে হঠাৎ ঐ স্থানে উপনীত দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত ও ভীত হইল। অনন্তর হোসন, দুর্গরক্ষার্থ ৫০০০ প্রহরী রাখিয়া, ৭০০০ অশ্বারোহী লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আকবরের বিশ্বাস ছিল দুর্গের প্রহরী সকলে তাঁহার পক্ষ হইবে, কিন্তু ঐ সেনাগণ তাঁহার বিপক্ষ হইল, তথাচ তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং শত্রুসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সংগ্রাম জয় করিলেন। হোসন আহত ও বন্দী হইলেন।

আকবর এত অল্প সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, ইহা অল্প সাহসের কর্ম্ম নহে। আরো আশ্চর্য্য এই শত্রুসেনা পলায়ন করিলে যখন তাঁহার সেনাগণ তাহা-

দের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, তখন তিনি কেবল২ ৩০ অশ্বা-
রোহী লইয়া এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐসমস্ত
বিপক্ষগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু
তিনি চতুরতাপূর্ব্বক রণবাদ্য বাজনের আজ্ঞা দিলেন।
ঐবাদ্য শুনিয়া শত্রুগণের মনে হইল বুঝি অনেক রাজ-
সেনা পশ্চাৎ আছে, এই ভাবিয়া সকলে পলায়ন করিল।
আকবর তখন ঐ দেশ অবাধায় পুনরধিকার করিলেন।

গুজরাট জয়ের পর আকবর বেহার ও বঙ্গদেশের রণ-
রঙ্গে মত্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বেহারের কিয়দংশ দিল্লী
রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু আদীল সাহের রাজত্ব
কাল অবধি বঙ্গদেশ পাঠানদিগের হস্তগত হয়। তদবধি
তাঁহারাই তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্প্রতি দাউদ
খাঁ ঐ দেশের রাজা হইয়া ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল
ও লম্পট ছিলেন একজন্য তাঁহার মন্ত্রীই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ
করিতেন। ক্রমে ঐ মন্ত্রী অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন।
তাহাতে দাউদ খাঁ উত্তরকালে রাজ্য নাশের আশঙ্কায়
তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এই কারণে মন্ত্রীর আত্মীয় গণ
সকলে রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। সুতরাং রাজ্যের
মধ্যে নানা গোল উপস্থিত হইল। এই সুযোগে আক-
বর দাউদ খাঁর স্থানে এক অঙ্গীকারপত্র লেখাইয়া লই-
লেন তিনি তাঁহাকে কর দান করিবেন। কিছুদিন পরে
দাউদ খাঁ ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন। তাহাতে বিবা-
দের সূত্রপাত হইয়া, আকবর র্মারম্ভে জলপথে মহাসমা-

রোহ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। দাউদ খাঁ তাঁহার আগমনে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে পলায়ন করিলেন। তাহাতে আকবর রাজা তোড়ল্‌মল্লকে বঙ্গদেশ জয়ের ভারার্পণ করিয়া আপনি আগ্রাতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা তোড়ল্মল আকবরের রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অতি বিচক্ষণ এবং যুদ্ধকর্ম্মেও সুপাণ্ডিত, কিন্তু বঙ্গদেশ যেমন সহজে জয় করিবেন মানস করিয়াছিলেন তাহা পারিলেন না। তাহার কারণ, দাউদ খাঁ পলায়ন করিয়াও বাজসেনাদিগকে দুইবার পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন করিলেন। তৎপরে যখন তিনি আপনি পরাজিত হইলেন তখনও তিনি আপনার পরাক্রম ছাড়িলেন না, উড়িষ্যা অধিকার করিয়া থাকিলেন। তোড়ল্মল এ প্রদেশ লইতে না পারিয়া কেবল বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন।

হিং ৯৮৪ }
খৃ ১৫৭৬ }

এই ব্যাপারের পর রাজা তোড়ল্মল ও আরং সৈন্যাধ্যক্ষেরা আগ্রাতে প্রত্যাগমন করিলেন, বঙ্গদেশে কেবল একজন কর্ম্মকর্ত্তা রহিলেন। এই ব্যক্তি গৌড়রাজধানীতে যাইয়া অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আকবর তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আর একজন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি কর্ম্মস্থলে পদার্পণ না করিতেই দাউদ খাঁ পুনর্ব্বার বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। সুতরাং পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে দাউদ খাঁ

হত হইলেন। তাহাতে বেহার ও বঙ্গদেশ দিল্লী রাজ্যভুক্ত হইল, এবং এই দুই প্রদেশে পাঠানদিগের আধিপত্য একবারে ঘুচিল।

কিন্তু বঙ্গদেশে অনেক রক্তের মনুষ্য একত্র হইয়াছিল তাহাতে ঐ দেশ একেবারে শীতল হইবে তাহার বিষয় কি। এই দেশে পূর্ব্বে মোগলদিগের গতিবিধি বা বসতি কিছুই ছিল না, কেবল পাঠানেরা আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। পরে মোগলেরা যখন উত্তর হিন্দুস্থান জয় করিল তখন পাঠানজাতীয় অনেকে মোগল রাজার কর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মোগল কর্ম্মকর্ত্তারা অনেকের অনেক জায়গীর ও আরং বৃত্তি হরণ করিলেন, এবং রাজার রাজস্ব পর্য্যন্ত উদরস্থ করিতে লাগিলেন। হিসাব চাহিলে বলিতেন যুদ্ধে সকল টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

রাজা তোড়লমল রাজস্বের কর্ম্মকর্ত্তা হইলে রাজস্ব বিষয়ে বড় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হইতে লাগিল। তিনি বঙ্গদেশের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে লিখিলেন সমুদয় রাজস্বের জমা খরচ এবং ব্যয়াবশিষ্ট রাজস্ব রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করিবে, আর জায়গীরভোগী ব্যক্তিরা সৈন্য সামন্ত রাখিয়া

হিং ৯৮৭ } রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করে কি না, তাহার
খৃ ১৫৭৯ } অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, আজ্ঞা দিলেন্

কোন্ ব্যক্তি কত সৈন্য রাখে তাহার তালিকা পাঠাইবে। এই আজ্ঞায় অভিনব কর্ম্মকারদিগের একেবারে চক্ষুঃস্থির

হইল। তাঁহারা সৈন্য সামন্ত কিছুই রাখিতেন না, যাহা পাইতেন সকলই আপনাদিগের উদরে দিতেন, হিসাব দিতে না পারিয়া রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন।

আকবর দেখিলেন বঙ্গদেশ জয় করা মিথ্যা হইল, কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে সর্ব্বৈব বিফল, অতএব পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহাতেও কোন ফল দর্শিল না। অতএব তিনি তোড়লমলকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন। তোড়লমল ভয় মৈত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক হিন্দুভূম্যধিকারিদিগের সহিত এক প্রকার বন্দোবস্ত করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু রাজমন্ত্রী বহু আকাঙ্ক্ষা করিয়া অধিক কর স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞাতে বিদ্রোহী ব্যতীতও অনেকে পলাতক হইল। তোড়লমল তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। অনন্তর আজিজ্ খাঁ নামে আর এক ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি কাহাকে অর্থ দিয়া, কাহার বৃত্তি সুস্থির রাখিয়া, বিরোধ ভঞ্জন করিলেন। তদনন্তর রাজকর রীতিমত সংগ্রহ হইতে লাগিল। মোগলেরা বিদ্রোহে ক্ষান্ত রহিল।

এই বিরোধের সময়ে দাউদ খাঁএর পারিষদ লোকেরা স্থির হইয়া ছিল এমত নহে। মোগলেরা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ করিলে, তাহারা কতু নামে এক প্রধানের আশ্রয় লইয়া উৎকল প্রদেশে অস্ত্রধারী হইল।

খৃঃ ১৫৮৮
শঃ ১৫১০

এবং উড়িষ্যা ও তদুত্তর বর্দ্ধমানের সান্নিধ্য দামোদর পর্য্যন্ত সকল স্থান অধিকার করিল। এই বিদ্রোহ শান্তি জন্য আকবর মানসিংহকে প্রেরণ করিল। মানসিংহ আকবরের বৈবাহিক, পূর্ব্বে কাবুলের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন, তিনি বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে পর বর্ষা আরম্ভ হইল। তাহাতে যুদ্ধের ব্যাঘাত প্রযুক্ত, সম্প্রতি যে স্থানে কলিকাতা হইয়াছে তিনি তথায় অবস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্র অনেক গুলিন সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন, তিনিও রণবন্দী হইলেন। ইহাতে যুদ্ধ জয়ের বিষয়ে আরও ব্যাঘাত হইল। কিছু দিন পরেই কতু পরলোক গমন করিলেন, এবং ঈশা নামে এক জ্ঞানবান ব্যক্তি তাঁহার পুত্রদিগের অভিভাবক হইলেন। মানসিংহ তাঁহার সহিত এই ধার্য্য করিলেন উড়িষ্যা প্রদেশ কতুর পুত্রদিগের থাকিবে, তাঁহারা দিল্লীশ্বরকে কিঞ্চিৎ করপ্রদান করিবেন।

এই প্রকার সন্ধিবন্ধন হইয়া সকল বিবাদ শেষ হইল; কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে ঈশা পরলোক গমন করিলে, তৎপরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি কতুর পুত্রগণের রক্ষক হইলেন তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রাজস্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত অযশ হইল, এবং আকবর পুনর্ব্বার মানসিংহকে পাঠাইলেন। মানসিংহ আসিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে পাঠা-

নেরা পরাস্ত হইয়া কটকে পলায়ন করিল, এবং নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিল। কিয়ৎকাল পরে (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) ওসমান নামে কতুর এক পুত্র মস্তকোত্তোলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তদবধি পাঠানদিগের রাজ্যাশা একবারে নিবৃত্ত হইল।

যখন বঙ্গ দেশে এই সকল রঙ্গ হইতে থাকে, তখন আকবরের ভ্রাতা মির্জা হাকিম পুনর্ব্বার পঞ্জাব রাজ্য আক্রমণ করেন। মানসিংহ ঐ রাজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন, তিনি স্থানভ্রষ্ট হইয়া লাহোরে পলাইয়া আসিলেন। আকবর তাহা দেখিয়া স্বয়ং পঞ্জাবে যাত্রা করিলেন। তৎকালে আকবরের অতিশয় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, তাঁহার আগমনে মির্জা হাকিম পলায়ন করিলেন। আকবর তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সিন্ধু-পারে কাবুল অধিকার করিলেন। হাকিম তৎকালে পর্ব্বতশিখরে পলায়ন করিয়া থাকিলেন। পরে ভ্রাতার নিকটে আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাকে কাবুল রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তদনন্তর আকবর স্বীয় শ্যালক রাজা ভগবান দাসকে পঞ্জাবের কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া, প্রত্যাগমন কালে সিন্ধু পারাবারের ঘাটে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ দুর্গ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। তাহার নাম অত্তক বারাণস।

হিং ৯৮৯
খৃ ১৫৮১

ইহার পর গুজরাটে আর একবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কারণ এই, মজাফর আকবরের

হিং ৯৮৯ } খৃ ১৫৮১ } হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলে, আকবর তাঁহার ভরণ পোষণার্থ উপযুক্ত জায়গীর দিয়া তাঁহাকে আগ্রাতে রাখিলেন। মজাফর এক প্রকার সচ্ছন্দে থাকিলেন। কিন্তু গুজরাটের লোকেরা তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিল তুমি এখানে আইস, তাহা হইলে আমরা তোমাকে পুনর্ব্বার গুজরাটের রাজা করিব। এই মন্ত্রণা পাইয়া তিনি আগ্রা হইতে গুজরাটে গমন করিলেন, এবং বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে মিলিয়া রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করিলেন। তদবধি ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধাদি হইতে লাগিল, তাহার পরে মজাফর রণবন্দী হইলেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে আগ্রাতে লইয়া যায় তখন তিনি একখান ক্ষুরদ্বারা আপন কণ্ঠদেশ ছেদন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই অবধি গুজরাটে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মির্জ্জা হাকিম পরলোক গমন করিলে, আকবর কাবুল রাজ্য অধিকার জন্য পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তদুপলক্ষে উত্তরের দুর্দ্দান্ত পর্ব্বতবাসীদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইল। এই সূত্রে তিনি কাশ্মীর রাজ্য জয় করেন, তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

কাশ্মীর রাজ্য হিমালয়ান্তর্গত পর্ব্বতের উপরে, চারিদিগে শৈলে বেষ্টিত। মধ্যস্থলে কাশ্মীর রাজ্য। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ শৈল হইতে বৃহত্তর নির্ঝর নির্গত হইয়া

মধ্যস্থলে দুইটী বৃহৎ ঝিল হইয়াছে। ঐ ঝিলের জল এক গভীর ক্যান্দোর দিয়া বহির্গত হইতেছে, তাহাতে ঝিলম* নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। ঝিলের মধ্যে অনেক ভাগ-মান ও মনোরম্য উদ্যান আছে, এবং চতুর্দ্দিগের গিরি-পার্শ্বে নানা প্রকার বৃক্ষে সুশোভিত। ঐসকল বৃক্ষে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সর্ব্বকালে নানা জাতীয় ফুল ও ফল ফলিয়া থাকে। অধিকন্তু চতুর্দ্দিগে উচ্চ শৈলশ্রেণী থাকাতে কোন দিগ হইতে উষ্ণ বা অতিশীতল বায়ুর গমনাগমন হয় না, সুতরাং সেই থানে বার মাস বসন্ত-কাল, এই জন্য অনেকে কাশ্মীর রাজ্যকে স্বর্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিবার যে সকল পথ আছে তাহা অতি দুর্গম ও ভয়ানক, অধিকাংশ পর্ব্বতশৃঙ্গ বাহিয়া উর্দ্ধে আরোহণ ও স্থানে ২ অধোমুখে অবরোহণ করিতে হয়। কোন স্থানে দুই দিকে উচ্চ গিরি, তাহার মধ্যদিয়া যাইতে হয়। কোন স্থানে বেগবৎ স্রোতের উপর বহির্গত পর্ব্বতশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন করিতে হয়। ইহা ভিন্ন পাকচক্র অনেক, এবং সকল পথই অপ্র-শস্ত ও বক্র, তাহাতে অনায়াসে বা অল্প ক্লেশে রাজ্য প্রবেশ করা দুর্ঘট। যদি কেহ এমন মনে করেন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে যাইবেন, তাহাও অসাধ্য, কেননা

* ঐ নদীর প্রাচীন নাম বিতস্তা।

পর্ব্বত সকল অতি উচ্চ, এবং প্রায় সর্ব্বকাল নীহারাবৃত থাকে, তাহাতে মনুষ্য গমনাগমন করিতে পারে না। সুতরাং এই স্থানে শত্রু শঙ্কা প্রায় নাই। অল্প সৈন্যে চারিদিক্ উত্তমরূপে রক্ষা হইতে পারে।

এই রাজ্যে প্রথমতঃ পাণ্ডুবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পর, এক জন মুসলমান তথাকার রাজা হয়েন, তদবধি মুসলমানেরা তথায় রাজত্ব করিয়া আসিতে ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল, তাহাতে আকবর ঐ রাজ্য লইবার কল্পনা করিয়া অত্তক হইতে স্বীয় শ্যালক রাজা ভগবানদাস ও সাহরোখ নামে আর এক প্রধানকে তথায় সটসন্যে প্রেরণ করিলেন। ইহাঁরা পথাভাবে প্রথমতঃ কাশ্মীর প্রবেশ করিতে পারেন নাই, পরে রক্ষকশূন্য এক দ্বার দিয়া অতি কষ্টে কোন প্রকারে রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু আহারীয় দ্রব্যাভাবে ঐ স্থানে অধিক কাল তিষ্ঠিতে না পারিয়া, কাশ্মীররাজের সহিত আপাততঃ এই প্রকার বন্দোবস্ত করিলেন, তিনি আকবরের প্রভুত্ব মাত্র স্বীকার করিবেন, কিন্তু আকবর তাঁহার রাজ্যে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না।

আকবর এই বন্দোবস্ত অগ্রাহ্য করিয়া পর বৎসর পুনর্ব্বার অন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দৈবাৎ ঐ সময়ে কাশ্মীররাজের সেনাদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইয়া-

ছিল, তাহাতে তাহাদের অনেকে আসিয়া আকবরের পক্ষে মিলিত হইল, আর২ সেনা সকল দ্বার রক্ষা না করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল। ইহাতে মোগল সৈন্যগণ বিনাবাধায় রাজধানী প্রবেশ করিল। কাশ্মীর-

হিং ৯৯৪ }
খৃ ১৫৮৬ }

রাজ সংগ্রামে অক্ষম হইয়া আকবরকে কাশ্মীর রাজ্য সমর্পণ করিলেন। এবং আপনি দিল্লীনগরে যাইয়া বৃত্তিভোগী হইয়া থাকিলেন।

আকবর কাশ্মীর জয়ের পর ঐ রাজ্যের সুখ সম্ভোগ জন্য তথায় গমন করিলেন। তাহার পরেও আর একবার ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তদনন্তর আর যাইতে পারেন নাই। কিন্তু উত্তরকালে যাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা সর্ব্বদা ঐ স্থানে যাইয়া উল্লাস করিতেন, যেহেতু তত্তুল্য আয়াসের স্থান পৃথিবীতে আর ছিল না।

কাশ্মীর জয়ের পর আকবর পেশওয়ারের প্রান্তরের উত্তরদিগের পর্ব্বতবাসী ও তদ্দক্ষিণে সলিমান ও খাইবর পর্ব্বতস্থ লোকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। পেশওয়ারের উত্তরে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত যে সকল পর্ব্বত আছে তাহা অতি উর্ব্বর, এবং তথাকার জল বায়ু প্রায় কাশ্মীরের তুল্য। ঐ স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বাস ছিল, পরে ইসফজী নামে এক জাতি কান্দারের নিকট হইতে আসিয়া ঐ স্থানে বাস করে, এবং তত্রস্থ প্রাচীন অধীন লোকেরা তাহাদিগের আজ্ঞাধীন হয়। কিন্তু

অঞ্চলে যাহারা বাস করিত তাহাদিগের নাম রসনিয়া অর্থাৎ উজ্জ্বলকারী, তাহারা কেবল এক পরমেশ্বর মানিত, আর কোন ধর্ম্ম বা কোরাণ কিছুই মানিত না। ঐ জাতীয়েরা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া ক্রমে এমত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে যে তাহাতে নিকটস্থ লোকেরা অস্থির হয়। কুলাধিপতি হাকিম সাহ তাহাদিগের দমন জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন না। পরে হাকিম সাহের মৃত্যুর পর যখন কাবুল রাজ্য আকবরের হস্তে পড়িল তখন তিনি রাজা মানসিংহকে কাবুল রাজ্যের অধিপতি করিলেন। ইহাতে রসনিয়াদিগকে দমন করিবার এক উপায় হইল। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে আকবর প্রধানতঃ রাজা বীরবর ও তাঁহার শালিপতি ভ্রাতা জৈন খাঁকে সেনাপতি করিয়া ইসফজীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রাজা বীরবর ও জৈন খাঁ পর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক অনেক দূর প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাহার পরে পর্ব্বতগুহা ও সুড়ঙ্গবৎ পথে এমত আবদ্ধ হইলেন যে তথা হইতে কোন প্রকারে বাহির হইতে পারিলেন না। ঐ সময়ে পর্ব্বতবাসী পাঠানেরা উপর হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সৈন্যেরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া বাহির হইতে না পারিয়া অশ্ব মনুষ্য মাতঙ্গ সকল জড়িত হইয়া পড়িল, কিছুমাত্র

শৃঙ্খলা রহিল না। পাঠানেরা উপর হইতে তাহাদিগকে অনিবার সংহার করিতে লাগিল। ইহাতে তাবৎ সেনা মারা পড়িল, এবং বীরবরও রণশায়ী হইলেন। জৈন খাঁ কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার তাবৎ সৈন্য হত হইল।

রাজা বীরবর রাজসভায় থাকিতেন, এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অতি সদ্বক্তা ছিলেন, তত্তুল্য সদালাপী ও উপস্থিতবক্তা রাজসভাতে আর কেহই ছিল না, ইহা ভিন্ন তাঁহার আর আর অনেক গুণ ছিল*। এই জন্য গুণ-গ্রাহী আকবর তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত শোকাকুলিত হইলেন।

বীরবরের মৃত্যুর পর আকবর তোডল্মল ও মানসিংহ-কে সেনাপতি করিয়া পুনর্ব্বার ঐ দেশে পাঠাইলেন। ইহাঁরা একেবারে পর্ব্বতে আরোহণ না করিয়া পর্ব্বতের নিম্ন স্থানে ইসফজীদিগের যে সকল চাসবাস ছিল তাহা বন্ধ করিয়াদিলেন। ইসফজীদিগের এমন সাধ্য হইল না, পর্ব্বতের নীচে আসিয়া মোগল সেনা-দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অতএব দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় তাহারা নতশির হইয়া আকবরের রাজপ্রভুত্ব স্বীকার করিল।

হিং ৯৯৫ }
খৃ ১৫৮৭ }

* বীরবরের অনেক অনেক কথা অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি মনোহর।

তদনন্তর মানসিংহ ও তোড়লমল খাইবার পর্ব্বতবাসী রসনিয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া একজন উত্তর আর একজন দক্ষিণ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। পাঠানেরা একেবারে দুইদিক রক্ষা করিতে না পারিয়া অপার্য্যমাণে পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু পাঠানজাতি অতি দুর্দান্ত, এপর্য্যন্ত কোন রাজা তাহাদিগকে একবারে বশীভূত করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ জলাল নামে তাহাদের রাজা যেপর্য্যন্ত জীবদ্দশায় ছিলেন সেপর্য্যন্ত তিনি মধ্যেং অস্ত্রধারণ করিতেন। পরে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর এই সকল যুদ্ধ এক প্রকার নিবৃত্ত হইল।

এই সকল যুদ্ধ উপলক্ষে আকবর ১৫ বৎসর সিন্ধুতটে বাস করিয়া ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি সিন্ধু রাজ্য জয় করেন। এই যুদ্ধে সিন্ধুরাজের পক্ষে দুইশত গোরা সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, ইহারা পর্ত্তুগীস। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় অনেক সৈন্য গোরাদিগের ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিল, তদবধি সেপাহীর সৃষ্টি।

এই সময়ে কান্ধার রাজ্যও উদ্ধৃত হয়। পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন হোমায়ুন এই রাজ্য বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আকবরের রাজ্যারম্ভ কালে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইলে, পারসরাজ শাহতমাস্প ঐ রাজ্য পুনরধিকার করিয়াছিলেন। আকবর ঐ সময়ে তাহা রক্ষা করিতে পারেন

নাই। পরে সাহ তমাস্পের মৃত্যুর পর তাঁহার নিজ রাজ্যে সেই প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনিও তাহা উদ্ধৃত করিলেন।

হিং ১০০৩ } খৃঃ ১৫৯৪

এই রূপে পশ্চিমে পারসস্থানের সীমা অবধি, পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব, উত্তরে হিমালয়, এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি ও সমুদ্র পর্য্যন্ত তাবৎ রাজ্য আকবরের দণ্ডাধীন হইল। মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ অবধি এপর্য্যন্ত কোন রাজা এতাদৃক্ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। আকবর এই সকল রাজ্য জয় করিয়া মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বসিলেন, তাঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সকল প্রদেশ সুশাসিত হইল। হিন্দু ও মুসলমানরাজারা তাঁহার আজ্ঞাকারী হইলেন, এবং অনেক রাজা তাঁহাকে করদান করিতে লাগিলেন। কেবল উদয়পুরের রাজা ও আফগানস্থানের পাঠানেরা অবাধ্য রহিলেন, তাঁহারা রাজপ্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই।

দক্ষিণের যুদ্ধ।

এই প্রকার তাবৎ উত্তর রাজ্য করস্থ হইলে, তখন কেবল দক্ষিণ রাজ্য জয় করিবার অপেক্ষা রহিল। ইহাতেও আকবরকে অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না, তাহার কারণ দক্ষিণ রাজ্যে তৎকালে মহা গোলযোগ উপস্থিত

হইয়াছিল। তদ্বিবরণ এই, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে মর্ত্তাজা-নিজাম আহম্মদ নগরের রাজা ছিলেন। তদনুজ বরবান ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হইবেন এই অভিলাষে রাজরাজেশ্বর আকবরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। আকবর সৈন্যসাহায্য করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। বরবান তদবধি আকবরের অনুগত হইয়া ছিলেন। পরে সহোদরের মৃত্যু হইলে তিনি, ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে, আকবরের বিনা সাহায্যে ঐ রাজ্য অধিকার করিয়া বিজয়পুরের রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন।

কিয়দ্দিবস পরে বরবান পরলোক গমন করিলে, স্বতন্ত্র ২ চারিব্যক্তি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যে যিনি রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন তিনি মোগলেশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। আকবর তাঁহার মনোরথ পূরণার্থ গুজরাট হইতে স্বীয় পুত্র মুরাদ, ও মালব হইতে আর দুই সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহারা তথায় উপনীত না হইতে হইতে চাঁদ-বিবি নাম্নী এক কামিনী, বাহাদুর-নামা স্বীয় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ, ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। রাজ্যাকাঙ্ক্ষী আর তিন ব্যক্তি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মোগল দল আহম্মদ নগরের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন রাজ্যরক্ষায় আপনাকে অক্ষম বুঝিয়া

চাঁদবিবি সৈন্যসাহায্যজন্য বিজয়পুরের রাজাকে পত্র লিখিলেন, এবং রাজ্যাকাঙ্ক্ষী আর তিন ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন, মোগলেরা রাজ্য লইতে উদ্যত, যদি এই-ক্ষণে আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি তাহা হইলে মোগলেরা অনায়াসে রাজ্যাধিকার করিবে, আমরা সকলে নৈরাশ হইব, অতএব সম্প্রতি পরস্পর বিবাদে বলক্ষয় না করিয়া প্রথমতঃ শত্রুক্ষয়ের চেষ্টা দেখ, তাহার পর আপনাদের মধ্যে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা যাইবে। এই কথায় সকলে সম্মত হইয়া রাজ্যরক্ষায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজপুত্র মুরাদ নগরাধিকারের আর কোন উপায় না দেখিয়া প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া নগর প্রবেশ করিবেন এই স্থির করিয়া প্রাচীরের নিম্নস্থ তিন স্থানে বারুদ প্রোথিত করাইলেন। চাঁদবিবি তাহা জানিতে পারিয়া ভিতর দিয়া বারুদ উঠাইয়া ফেলাইলেন। কিন্তু এক স্থানের সকল বারুদ উঠিল না, তাহাতে যখন বিপক্ষ পক্ষীয় লোকেরা ঐ বারুদে অগ্নিদান করিল, তখন প্রাচীর ফাঁক হইয়া পড়িল, এবং শত্রুসৈন্য ঐ স্থান দিয়া নগর প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল।

চাঁদবিবি ঐ সময়ে চামুণ্ডার ন্যায় নিষ্কোষিত অসি হস্তে অশ্বারোহণে সেই স্থানে দাঁড়াইলেন *। তাঁহার

* কথিত আছে চাঁদবিবি রূপার গুলি পুরিয়া বন্দুক ছাড়িতেন। এক জন মুসলইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, যখন মোগলদিগের

সেনা ও সেনাপতিগণ ক্রমে তাঁহার নিকট আসিয়া শ্রেণী-বদ্ধ হইল, এবং তাঁহার উৎসাহে অতিসাহসে বিপক্ষপক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর অনল ও শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাতে মোগল দল এক পদ অগ্রসর হইতে পারিল না, অনেকে রসাতল গেল। যুবরাজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। মনে করিলেন রজনী প্রভাত হইলে নগর প্রবেশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন। কিন্তু প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন প্রাচীরের যে স্থান দিবসে ভঙ্গ করা গিয়াছিল তাহা রাত্রির মধ্যে পুনগ্র থিত হইয়াছে, অতএব পুনর্ব্বার বারুদ দ্বারা প্রাচীর ভেদের আয়োজন করিতে লাগি-লেন। ইতিমধ্যে বিজয়পুরের রাজা ও আরং বন্ধু সৈন্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে যুবরাজ

হিং ১০০৪ খৃ ১৫৯৬ } মুরাদ অনেক বল সত্ত্বেও যুদ্ধ জয়ের আ-শাতে নিরাশ হইয়া চাঁদবিবির সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন। সন্ধির মর্ম্ম এই, আহম্মদ নগরের রাজা সংপ্রতি যে বেরার রাজ্য লইয়াছিলেন, তাহা মোগলদিগকে দিবেন, মোগলেরা আর যুদ্ধ করিবেন না।

এই প্রকার সন্ধি বন্ধনের পর যুদ্ধাদির বিরতি হইল। কিন্তু এক বৎসর না যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার গৃহবিবাদ

সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তিনি স্বর্ণ ও রত্নাদি পুরিয়া মোগলদিগকে বন্দুক করিয়াছিলেন।

আরম্ভ হইল, তাহাতে চাঁদ বিবির কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার সহিত বহিরঙ্গতা করিয়া রাজপুত্র মুরাদকে আহ্বান করিলেন। রাজপুত্র তখন পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশে ছিলেন, অতএব তাঁহার পক্ষ হইয়া চাঁদ বিবির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং খন্দেশের রাজাও তাঁহার সঙ্গে মিলিলেন। বিজয়পুরের রাজা পূর্ব্বাবধি চাঁদ বিবির পক্ষ ছিলেন, তদ্ভিন্ন গোলকন্দার রাজাও তাঁহার পক্ষ হইলেন। এই প্রকার সমরসজ্জা হইয়া গোদাবরীতীরে মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ দুই দিবস পর্য্যন্ত চলিল, কিন্তু জয়াজয় কিছুই নিশ্চয় হইল না, তাহাতে আকবর স্বয়ং দক্ষিণ দেশে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে মোগল সেনাগণ দৌলতাবাদ প্রভৃতি আর২ স্থান সকল অধিকার করিল। আকবর নর্ম্মদাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালকে সেনাপতি করিয়া তাপ্তি নদীর তট দিয়া আহম্মদ নগর আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে নহাঙ্গ নামে চাঁদ বিবির এক শত্রু ঐ নগর বেষ্টন করিয়াছিলেন। মোগল সৈন্য উপস্থিত হইতেই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চাঁদ বিবি মোগলদিগের সহিত পূর্ব্বে যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এখনও সেই প্রকার যুদ্ধ করিতে না পারিতেন এমন নহে, কিন্তু গৃহের শত্রুকে মহাশত্রু জ্ঞান করিয়া তিনি মোগলদিগের সহিত সন্ধি করণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্বীয় সৈন্যেরা

তাঁহার প্রতিপক্ষের পরামর্শানুসারে একেবারে অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বধ করিল। কিন্তু ইহার ফল তাহারা হাতে হাতে প্রাপ্ত হইল। যেহেতু মোগল সেনারা তৎপরে ঐ নগর অধিকার করিয়া তাহাদিগকে একবারে যমালয়ে প্রেরণ করিল, এক প্রাণিকেও রাখিল না।

এই ব্যাপারের পর মোগলেরা আহম্মদ নগরের শিশু রাজাকে বন্দি করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতে যুদ্ধ শেষ হইল না, বিপক্ষেরা আর এক জনকে রাজা করিয়া সিংহাসনে বসাইল। ইহাতে ঐ যুদ্ধ আরো কয়েক বৎসর চলিল। আকবর যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাহার কারণ, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সলীম নিতান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। অতএব

হিং ১০০৯ }
খৃ ১৬০১ }

আবলফজলকে সেনাপতি করিয়া আপনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। দানিয়াল বিজয়পুরের রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনিও বেরার ও খান্দেশের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া ঐ প্রদেশে থাকিলেন।

সলীম শিশু বা অজ্ঞান ছিলেন না, তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর হইয়াছিল, এবং তিনি বিদ্বান ও জ্ঞানবান ছিলেন। পরন্তু আকবর তাঁহাকে আজমীরের সুবাদারী দিয়া ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানে তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত পান দোষ ছিল, তিনি অহিফেন ও মদ্যপানে দিবারাত্র বিহ্বল থাকাতে

তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না, তাহাতে, পিতা কতকালে মরিবেন তাহার পর রাজ্য পাইব, এই ভাবিয়া, আকবর দক্ষিণ রাজ্য গমন করিলে, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আগ্রা অধিকারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা পারিলেন না, কেবল বেহার ও অযোধ্যা অধিকার করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা দিলেন, এবং আলাহাবাদে রাজধানী করিলেন।

আকবর আগ্রাতে প্রত্যাগত হইয়া পুত্রকে পত্র লিখিলেন, যেকর্ম্ম করিয়াছ তাহা অতি গর্হিত, এমন কর্ম্ম আর করিও না, এবং এখনও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল, নতুবা অমঙ্গল ঘটিবে। এই পত্র পাইয়া সলীম যথোচিত খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক পিতার সহিত সাক্ষাৎ জন্য আগ্রাতে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত অনেক সৈন্য সামন্ত চলিল, আকবর তাহা জানিয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যদি তোমার সাক্ষাৎ করিবার মানসে আসা হয় তাহা হইলে তুমি স্বল্প লোক সমভিব্যাহারে আসিবে, নতুবা আসিবার প্রয়োজন নাই। এই লিখন পাইয়া সলীম বক্রভাবে আলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। আকবর কি করেন পুত্রের সান্ত্বনা জন্য তাঁহাকে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সুবাদারী দিয়া, রাজমন্ত্রী আবলফজলকে দক্ষিণ রাজ্য হইতে উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন।

আবলফজল এই আজ্ঞা পাইয়া গোয়ালিয়র দিয়া দেশে

আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত আর্চরের রাজা নরসিংহ দেব তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড সলীমের নিকট প্রেরণ করিলেন। আবুলফজল আকবরের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং দুই দিবস আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া থাকিলেন। আকবর জানিতে পারিলেন সলীম হইতে এই কর্ম্ম হইয়াছে,* কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করিয়া হত্যাকারীর দণ্ডের চেষ্টা করিলেন, ইহাতেও পুত্রের সহিত পুনর্ব্বার মনান্তর হইল।

কিয়ৎকাল পরে পিতা পুত্রের বিরোধ ভঞ্জন হইল। তাহার পর আকবর আলাহাবাদ হইতে তাঁহাকে আনাইয়া রাজবেশ ধারণের অনুমতি দিলেন। সলীম যেপর্য্যন্ত পিতার নিকট থাকিলেন সে পর্য্যন্ত অতি বিশিষ্ট ধারায় চলিলেন, কিন্তু আলাহাবাদে পুনর্গমন করিয়া পুর্ব্বমত মদ্য পান ও ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইলেন এবং নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। পরন্তু খসরু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল, পাছে পিতা তাঁহাকে দিল্লীরাজ্যের অধীশ্বর করেন এই আশঙ্কায় তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অত্যা-

* সলীম স্বীয় জীবনচরিতে লিখিয়াছেন আবলফজল কোরাণ মানিতেন না, এজন্য তিনি তাঁহাকে বধ করেন এবং তাঁহার পরামর্শে আকবর মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগের বাঞ্ছা করিয়াছিলেন এইজন্য তিনি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন।

চার * করিতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচার উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী খসরুর গর্ব্ভধারিণী বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন †। এই সকল কথা শুনিয়া আকবর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, অতএব যখন তিনি রাজধানীতে আসিলেন তখন তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

কিয়ৎ দিবস পরে আকবরের তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের মৃত্যু হইল। দানিয়াল ভ্রাতার ন্যায় অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন, আকবর তন্নিবারণের অনেক যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আপন বিশ্বাসী লোক রাখিয়া দিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাকে মদ্যপান করিতে দিত না। কিন্তু তিনি তাহাদের চক্ষে ধুলা দিয়া বন্দুকের নলের ভিতর করিয়া মদ্য আনাইয়া পান করিতেন। এই প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়া অতি ত্বরায় তিনি আপনি আপনার মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন।

আকবর, দানিয়ালের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইলেন, বিশেষ ইহার পূর্ব্বে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই শোকের উপর আবার এই শোক পাইলেন। শোকেং

---

* মধ্যে তিনি একজন জিয়ন্ত মনুষ্যের চর্ম্ম ভেদ করাইয়াছিলেন। আকবর এই সংবাদ শুনিয়া খেদ করিতেং বলিলেন, যে ব্যক্তির পিতা মৃত জন্তুর চর্ম্মভেদ দেখিয়া মনেং ব্যথিত হয় তাহার সন্তান জিয়ন্ত মনুষ্যের চর্ম্ম ভেদ করে এ কি আশ্চর্য্য।

† ইনি মানসিংহের ভগ্নী।

তাঁহার শরীর একবারে জীর্ণ হইল, এবং ক্রমেং নানা রোগ উপস্থিত হইল। তাহাতে জীবন আশায় নিরাশ হইয়া তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে উত্তরাধিকারী করিবেন ইহা স্থির করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। অনেকের এমন আশঙ্কা ছিল সলীম রাজা হইলে তাঁহাদের প্রভুত্ব থাকিবেনা, অতএব তাঁহাকে রাজ্য না দিয়া তাঁহার পুত্র খসরুকে রাজ্য দিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আকবর সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সলীমকে রাজসিংহাসন দিবার প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। তখন উত্তরাধিকারিত্বের আর কোন গোল রহিল না। পরে তাঁহার অন্তিম সময়ে সলীম ও সভাসদগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন আমি যাহাই করিয়া থাকি যদি আমাকর্ত্তৃক কাহার অনিষ্ট হইয়া থাকে তবে তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিবে। সলীম পিতার এই কথা শুনিয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আকবর যে করবাল-খানি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন অঙ্গুলী দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়া সলীমকে তাহা কটিদেশে ধারণ পূর্ব্বক রাজবেশে তাঁহার সম্মুখে দাণ্ডাইতে বলিলেন। সলীম রাজবেশে দণ্ডায়মান হইলে আকবর অন্তঃপুরস্থ যাব-তীয় নারী ও তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও কর্ম্মকারী-দিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন ইহাদিগকে

হিং ১০১৪ খৃ ১৬০৫ বং ৪৮০৭ } পালন করিবে। তদনন্তর পুরোহিত ডাকাইয়া তাঁহার সম্মুখে ঈশ্বরভক্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক, আক্টবর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে, রাজ-রাজেশ্বর দিল্লীশ্বর ঈশ্বরলোক গমন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

আকবরের চরিত্র।

আকবর অতি সুপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার কথা বার্ত্তা ও ব্যবহার অতি মোহিতকর ছিল। যৌবনাবস্থাতে আকবর আহার পানে অত্যন্ত আমোদ করিতেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে সে আমোদ কিছুই ছিল না, তিনি অতি পরিমিতাহারী হইয়াছিলেন। বৎসরের মধ্যে তিন মাস আমিষ ভোজন করিতেন না। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম-পরায়ণ ছিলেন, দিবসে একবার বিশ্রাম করিতেন না, এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রালাপ করিতেন, অত্যল্প-কাল নিদ্রা যাইতেন। বস্তুতঃ তিনি কার্য্য কর্ম্মের এমন সুনিয়ম করিয়াছিলেন যে যুদ্ধ বিগ্রহে নিয়ত আবদ্ধ থাকিয়াও পুস্তকপাঠ, ধর্ম্মালোচনা, ও মৃগয়ার্থ, অনেক অবকাশ পাইতেন। আকবরের শাস্ত্রালাপে যেমন অনুরাগ শীকারেও সেইপ্রকার আমোদ ছিল, বিশেষ ব্যাঘ্র-বধ ও বন্য হস্তী ধৃত করণে অধিক আগ্রহ ছিল, প্রাণ যাইবে বলিয়া কিছুমাত্র শঙ্কা করিতেন না। তাঁহার

শরীরেও অত্যন্ত বল ছিল, তিনি এক এক দিবস এক শত দেড় শত ক্রোশ পথ অশ্বারোহণে অবলীলাক্রমে গমন করিতেন, এবং বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ অনায়াসে পদব্রজে গমন করিতে পারিতেন। তিনি সংগ্রাম-সময়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতেন, যুদ্ধ শেষ না হইলে সমরস্থল ত্যাগ করিয়া আসিতেন না। তিনি সকল কর্ম্ম আপন চক্ষে দেখিতেন, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা সম্পূর্ণ না হইলে নিবৃত্ত হইতেন না। এই নিমিত্তই তাঁহার রাজ্যকালে সকল দেশ উত্তমরূপে শাসিত হইয়াছিল।

রাজ্যবৃদ্ধি।—আকবরের রাজ্যলোভ ছিল না এ কথা বলা যাইতে পারে না, তিনি রাজ্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা নিতান্ত লোভের কর্ম্ম নহে। তিনি যে সকল রাজ্য জয় করেন তাহা পূর্ব্বে দিল্লীর রাজাদিগের অধিকার ভুক্ত থাকিয়া ক্রমে২ হস্তান্তরিত হয়। ঐ সকল রাজ্য উদ্ধার না করিলে তাঁহার যশঃশশধরে কলঙ্ক থাকে, এই জন্য তাহা জয় করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, তত্তুল্য বৃহৎ রাজ্য আর কোন মুসলমান রাজার ছিল না, কিন্তু প্রজাহিতৈষী বলিয়া রাজসমাজে আকবরের যে গৌরব তাহা যুদ্ধ দ্বারা হয় নাই, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিচার এবং রাজ্য ও প্রজাপালনের সুনিয়ম দ্বারাই হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

ধর্ম্ম।—আকবর যৌবনাবস্থায় অনেক তীর্থ দর্শন ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যখন

তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর তখনও মক্কা গমনের ঐকান্তিক বাসনা করিয়াছিলেন। তাহার পর মুসলমান ধর্ম্মের সত্যতা বিষয়ে তাঁহার মনে সংশয় জন্মে, তাহাতে তিনি সত্য ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক একত্র করিয়া শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম্মবিচার করিতেন। ফৈজী ও আবলফজল এই মহৎ অনুষ্ঠানের সহকারী ছিলেন। আগ্রাতে মোবারক নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন, এই দুই ব্যক্তি তাঁহার পুত্র। ফৈজী আকবরের আদেশ ক্রমে ছদ্মবেশে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণের স্থানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ন্যায়দর্শন প্রভৃতি অনেক সংস্কৃতপুস্তক পারসী ভাষাতে অনুবাদ করেন, এবং হিব্রু ভাষা হইতে বীজগণিত ও লীলাবতী নামক ভাস্করাচার্য্যের রচিত গ্রন্থ ভাষান্তর করেন। তদ্ভিন্ন বেদ রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থ পারসী ভাষাতে অনুবাদ হয়, তাহা তিনি সংশোধন করেন। আবলফজলও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞ ও সমরদক্ষ ছিলেন। তিনি ক্রমে রাজমন্ত্রী হয়েন এবং আকবরনামা অর্থাৎ আইন আকবরী গ্রন্থ রচনা করেন*।

* আকবর সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপ জানিতেন, এবং আর আর অনেক ভাষা শিখিয়াছিলেন। পরে গোয়া হইতে ফরাবাতন নামে এক পণ্ডিত আনিয়া কতকগুলিন যুবা লোককে গ্রীক ভাষা শিখাইয়াছিলেন। তাহারা গ্রীক ভাষা শিখিয়া ঐ ভাষার অনেক পুস্তক পারসী ভাষাতে অনুবাদ করেন।

আকবর এই দুই ভ্রাতাকে লইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিষয়ক পরামর্শ করিতেন, এবং প্রতি শুক্রবারে এক সভা করিয়া ধর্ম্মব্যবসায়ী সকল লোকের সহিত শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম্মবিচার করিতেন, এক এক দিবস এই বিচারে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত, তথাপি বিচার শেষ হইত না শুক্রবার ভিন্ন অন্য দিবসেও ব্রাহ্মণ ও মুসলমান পণ্ডিত দিগকে আনাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতেন। মধ্যে ২ ঈশু খৃষ্ট উপাসক দিগকে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত বিচার করিতেন। এক সময়ে কএক জন হিব্রু পণ্ডিত রাজসভাতে আসিয়াছিলেন, মুসলমান পণ্ডিতেরা তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন আমরা কোরান হস্তে অগ্নিকুণ্ড প্রবেশ করিতেছি, যদি মুসলমান ধর্ম্ম মিথ্যা হয় তবে কোরান ভস্ম হইয়া যাইবে, যদি তাহা না হয় তবে তোমরা অঙ্গীকার করিয়া বল মুসলমান ধর্ম্ম মান্য করিবে। নতুবা তোমরা বাইবল হস্তে অগ্নি কুণ্ড প্রবেশ কর, যদি তোমাদের ধর্ম্ম পুস্তক ভস্ম না হয়, আমরা খৃষ্ট ধর্ম্ম মানিব। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা এই পরীক্ষাতে স্বীকৃত হইলেন না।

আকবর জানিয়াছিলেন মনুষ্য যেমনই বিদ্বান বা বুদ্ধিমান হউন তথাপি পদে পদে ভ্রম আছে, অতএব তিনি স্থির করিয়াছিলেন মনুষ্যপ্রণীত ধর্ম্ম কখনই ভ্রম শূন্য হইতে পারে না। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মের মূল শুদ্ধ নহে, যেহেতু তাহা মনুষ্যপ্রণীত। তিনি বলিতেন জ্ঞানবলে

পরমেশ্বরকে জানিয়া তাঁহার আরাধনা করা, এবং যে কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বরের সন্তোষ, জগতের মঙ্গল, ও ভবিষ্যতে সুখের সম্ভাবনা সেই উত্তম ধর্ম্ম, তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, মনুষ্যের কথা অনুসারে কোন ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম জ্ঞান করা উচিত নহে। এক পরমেশ্বর ভিন্ন যদি অন্য কোন দৃশ্যমান বস্তুর উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে সূর্য্য নক্ষত্রাদি বা অগ্নি আরাধনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতেও বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন করে না। অর্থাৎ লোক দেখাইয়া বা পুরোহিত আনাইয়া কিম্বা উপবাস করিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। কোরানে লেখে বিশিষ্ট মুসলমানেরা শ্মশ্রু ধারণ ও ত্বক্ ছেদ করিবে। শ্মশ্রু ধারণ ও ত্বক্ ছেদ কখন ধর্ম্মাঙ্গ নহে। কোরানে আরো লেখে সকল মুসলমান উপবাস, তীর্থগমন ও অনেকে একত্র হইয়া ঈশ্বরারাধনা করিবে। এই সকল ধর্ম্মাড়ম্বরমাত্র, ইহাতে প্রকৃত পুণ্য সঞ্চয় হয় এমত বলাযাইতে পারে না। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আকবর আজ্ঞা দিয়াছিলেন এই সকল কর্ম্মে কেহ কাহার প্রতি বল প্রকাশ বা ধর্ম্মভয় প্রদর্শন করিতে পারিবে না, যাহার ইচ্ছা হয় করিবে, যাহার ইচ্ছা না হয় করিবে না। ইহা ভিন্ন মদ্যপান দ্যূতক্রীড়া কোরানে নিষেধ ছিল, আকবর তাহার বিধি করিলেন, এবং কোন২ পশু স্পর্শ নিষেধ ছিল সে নিষেধও রহিত করিয়াদিলেন।

আকবর এমত ইচ্ছা করেন নাই যে মুসলমান ধর্ম্মের

একবারে উচ্ছেদ করিবেন, কিন্তু মহম্মদের পলায়ন অবধি যে হিজরি অব্দ চলিয়া আসিতেছিল তিনি তাহা রহিত করিয়া আপনি যে বৎসর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সেই বৎসরের উত্তরায়ণের বিষুব অবধি অব্দগণনার আজ্ঞা দেন এবং আরবীয় মাসের পরিবর্ত্তে সৌর মাস ব্যবহার করিয়া মাসের পারসী নাম * দেন। তদ্ভিন্ন প্রচলিত আরবী † ভাষা উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং কোরান-বিধেয় শ্মশ্রুধারী লোকমাত্রকে নিকটে আসিতে দিতেন না, ইহাতে ধর্ম্মপরায়ণ বা ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আর এক আজ্ঞা প্রকাশ করেন সময়বিশেষে পারস্যস্থানের প্রাচীন রীত্যনুসারে লোকেরা তাঁহার সম্মুখে অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবে। ইহাতেও মুসলমানেরা অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন কেবল দেবতাকে এরূপ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা যাইতে পারে, মনুষ্যকে করা যাইতে পারে না।

হিন্দুধর্ম্মে পরধর্ম্মের দ্বেষ করে না এজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় নাই; তবে অনলকুণ্ডে

* এই সকল মাস পূর্ব্বকালে পারস্যস্থানে ব্যবহার ছিল।

† পূর্ব্বে কাহার সহিত কাহার সাক্ষাৎ হইলে লোকেরা সেলাম আলেকম (তোমার স্বচ্ছন্দ হউক) বলিয়া সম্ভাষণ করিত। আকবর তাহা উঠাইয়া আজ্ঞা দিলেন আল্লা আকবর, অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই বলিয়া সম্ভাষণ করিবে। তাহার উত্তর করিতে হইলে জিল্লীজলালহু বলিবে অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্যোতি দীপ্তিমান হউক।

প্রবেশ করিয়া কলঙ্ক পরিহার, অযোগ্য বয়সে কন্যা-দান ও যজ্ঞ জন্য বলিদান এই সকল কর্ম্ম গর্হিত বিবেচনা করিয়া আকবর তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং সতীর অসম্মতিতে সহগমন করিতে দিতেন না। এই বিষয়ে তাঁহার ভারি পীড়াপীড়ি ছিল। যোধপুরের রাজার পুত্রের মৃত্যু হইলে রাজা তাঁহার পুত্রবধূকে সহগমনের আজ্ঞা দেন। পুত্রবধূ সহগমনে সম্মতা ছিলেন না, এজন্য রাজা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সহগমন করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আকবর এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং যোধপুরে গমন করিয়া সহগমন নিবারণ করিলেন। অপর হিন্দুরাজ্যে এমত রীতি ছিলনা, বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে, আকবর আজ্ঞা দিলেন বিধবার ইচ্ছা হইলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবে।

হিন্দুদিগের সম্পর্কে আকবর আর যাহা যাহা করিয়াছিলেন সকলি উত্তম। তিনি হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলকে সমভাবে দৃষ্টি করিতেন, এবং উভয় জাতিকে* উচ্চং ও সম্মানের কর্ম্ম প্রদান করিয়া ছিলেন। জাইজা নামে কাফর জাতির উপর এক কর ছিল, ইহাতে রাজধর্ম্মাবলম্বী লোক দিগের সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগের সর্ব্বদা বিরোধ ও দ্বেষাদ্বেষ হইত। আকবর ঐ কর রহিত করি-

* তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দুরা মনসবদারী, রায়রায়ানি, দেওয়ানি, পেস্কারি, কানুনগোয়ী, কারকনী ও খাজাঞ্চী পদে নিযুক্ত হইতেন। কেহ কেহ সুবাদারী পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন।

লেন, তাহাতে ঐবিরোধ ও দ্বেষাদ্বেষ নিবারণ হইল। অপর তীর্থযাত্রিদিগের উপর আর এক কর ছিল, তাহার তাৎপর্য্য এই, কর দিতে হইলে পৌত্তলিকেরা তীর্থ গমনে ক্ষান্ত হইবে, সুতরাং পৌত্তলিক ধর্ম্ম ক্রমশ হ্রাস হইবে। কিন্তু সকল মনুষ্য পরমেশ্বরকে এক ধারায় উপাসনা করেনা, ভিন্ন২ জাতীয় লোকেরা ভিন্ন২ ধারায় উপাসনা করিয়া থাকে। যিনি যে ধারায় উপাসনা করুন, সকলের মূল অভিপ্রায় এক, অতএব কাহার ধর্ম্মপথে কন্টক ক্ষেপণ উচিত নহে এই বিবেচনা করিয়া আকবর যাত্রীর কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আর এক রীতি ছিল দুর্গ আক্রমণ কালে দুর্গরক্ষক সেনারা অত্যন্ত পীড়াদান করিলে "আক্রমণকারী দুর্গজয়ের পর সেনা ও তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র সকলকে লইয়া দাস করিতেন। এই কুৎসিত রীতি ক্রমে আরো পীড়াকর হইয়াছিল। জয়কর্ত্তা নিরীহ গ্রামবাসী দিগকে বন্দীবেশে আনিয়া বিক্রয় করিতেন। আকবর এই কুরীতি একবারে রহিত করিয়া দেন। এই কর্ম্ম সকল জাতির পক্ষে মঙ্গলকর হইল, কিন্তু ইহাতে হিন্দুদিগের বিশেষ উপকার দর্শিল।

আকবর যে ধর্ম্ম চালাইবার যত্ন করিলেন তাহার নাম "দীন এলাহি" ব্রহ্ম ধর্ম্ম। আকবরের এমন অভিপ্রায় ছিলনা আপনার মত বলপূর্ব্বক চালান। তিনি মনে করিয়াছিলেন সকলকে সম্মত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা প্রচলিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার পারিষদ ও ভৃত্যগণ

কেবল ঐ মতানুসারে চলিতেন, ধর্ম্মানুরক্ত ভক্ত মুসল-মানেরা তাহা মানিতেন না। বিশেষ আকবরের ভূসম্বন্ধীয় কার্য্যে যে সকল মল্লা দিগের বৃত্তিচ্ছেদ হইয়াছিল তাহারা. তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছিলেন। বোধ হয় ইহাদিগের কাহারং প্রতি তিনি বলপ্রকাশ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কাহার প্রতি দৌরাত্ম্য করেন নাই, যে যেমন মনুষ্য তাহার সহিত সেই প্রকার ব্যবহার করিতেন, অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহা-দিগকে উত্তম ২ কর্ম্ম দিতেন, যাঁহারা তাহা করেন নাই তাঁহাদিগের প্রতি সে রূপ অনুগ্রহ করিতেন না।

এই প্রকারে তিনি ক্রমেং অনেককে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যে মত তাহা অতি সূক্ষ্ম, কেবল জ্ঞানবান লোকেই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন, আপামর সাধারণ সকলে তাহার ভাব বুঝিতেন না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর সে মত প্রচলিত রহিল না। জাহাঙ্গীর রাজা হইয়া তাহার অনেক অন্যথা করিলেন। পরে মুসলমানদিগের পূর্ব্ব রীতি ও ক্রিয়া কাণ্ডাদি ক্রমে-ক্রমে পুনঃস্থাপিত হইতে লাগিল। সৌর বৎসর অনেক দিবস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, কিন্তু তাহাও ক্রমে লোপ পাইল। তবে আকবরের ধর্ম্মান্দোলনে এই এক মহোপকার হই-য়াছে, পূর্ব্বে মুসলমানেরা মুসলমান ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করিতেন না, কেবল ঐকান্তিক ভক্তি পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম মানিতেন। আকবরের সময়াবধি

সকলের চক্ষু বিকসিত হইয়াছে, এইক্ষণে ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিষয়ে সকলে তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন।

যাহাহউক আকবরের মতকে নূতন বলা যাইতে পারেনা, কবীরপন্থি নামে আকবরের রাজত্বের একশত বৎসর পূর্ব্বে এক হিন্দু সম্প্রদায় ছিল, তাঁহারা একেশ্বরবাদী ছিলেন, ইহারা আর আর দেবতা অমান্য করিতেন না। আকবরেরও সেই মত ছিল, তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন বোধ হয় তাঁহাদের দেখিয়াই করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক আর কোন মুসলমান রাজা ধর্ম্মবিষয়ে এমত বিচক্ষণ ছিলেন না, আকবর সকল রাজার শ্রেষ্ঠ।

রাজস্ব সংগ্রহের নিয়ম।—আকবরের কর গ্রহণের প্রথা অতি উত্তম বলিয়া গণনীয় হইয়াছে। সের সাহ রাজা হইয়া এই ধারানুসারে কর গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহাতে তাহা সম্যক রূপে চলন করিতে পারেন নাই। আকবর ঐ ধারা সংশোধন পূর্ব্বক তদনুসারে জরিপ জমাবন্দী ও কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ভূমি মাপের নানাপ্রকার যন্ত্র ছিল, সে সকল রহিত করিয়া তিনি এক প্রকার গজ অর্থাৎ হাতকাঠী স্থাপন করিলেন। এই হাতকাঠীতে রাজ্যের যাবতীয় ভূমি মাপ করাইলেন। পরে ভূমির শস্য উৎপাদন শক্তি বিবেচনা করিয়া তাহা তিন প্রকারে বিভক্ত হইল। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মধ্যম ও নিকৃষ্ট।

এই তিন প্রকার ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইত, তাহার গড় পড়তা করিয়া কর স্বরূপ তিন ভাগের এক ভাগ* আপনি গ্রহণ করিতেন, অপর দুই ভাগ প্রজাকে দিতেন।

যে ভূমিতে সকল সময়ে শস্য জন্মিত কখন পতিত রাখিতে হইত না, তাহার রাজস্বের ন্যূনাতিরেক হইত না। যে ভূমি মধ্যে২ পতিত রাখিতে হইত তাহার শস্য উৎপাদন হইলে রাজস্ব দিতে হইত, নতুবা রাজস্ব দিতে হইত না। যে ভূমি বন্যাতে ডুবিয়া যাইত অথবা তিন বৎসর পতিত থাকিত, কিম্বা আবাদে ব্যয়বাহুল্য

* যথা—এক খণ্ড ভূমিতে গম জন্মে

উৎকৃষ্ট ভূমির উৎপন্ন প্রতি বিঘাতে ১৮ মোন।
মধ্যম ভূমির - - - ঐ - ১২ মোন।
নিকৃষ্ট ভূমির - - - ঐ - ৮৸৫ মোন।

সর্ব্ব শুদ্ধ - - - - - ৩৮৸৫ উৎপন্ন হয়।
উহার গড় - - - - - ১২৸৮৷ সের।
রাজার প্রাপ্য - - - - - ৪.২ ৸/০।

আর এক ভূমিতে তুল জন্মে

প্রথম জাত ভূমির উৎপন্ন - - - ১০ মোন।
দ্বিতীয় - ঐ - - - ৭৷০ মোন।
তৃতীয় - ঐ - - - ৫ মোন।

মোট - - - - ২২৷০ মোন।
গড় - - - - ৭৷০ মোন।
রাজার প্রাপ্য - - ২৷০ মোন।

সেরসাহ উৎপন্নের চতুর্থাংশের এক অংশ গ্রহণ করিতেন ইহা ভিন্ন অন্য অন্য বাব আবওয়াব ছিল, তাহাতে প্রায় তৃতীয় অংশের তুল্য হইত।

হইত, তাহার রসদ জমা খার্য্য হইত, অর্থাৎ প্রথম বৎসরে পঞ্চমাংশের দুই অংশ, দ্বিতীয় বৎসরে পঞ্চমাংশের তিন অংশ, এই প্রকার পাঁচ বৎসরে পুরা জমা দিতে স্থির হইত। যে ভূমি পাঁচ বৎসরের অধিক পতিত থাকিত তাহার রসদ আরো কম হইত। আমলা খরচা ও আর কোন বাব আবওবাব ছিল না। প্রজারা শুদ্ধ রাজার প্রাপ্য অংশ দিতেন। যে স্থলে শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রা লওয়া হইত সে স্থলে গত উনিশ বৎসরের মূল্য গড় করিয়া যে পড়তা হইত সেই হারে মালগুজারি করিতে হইত। এই সকল বন্দোবস্ত প্রথমতঃ এক বৎসরের জন্য হইয়াছিল, পরে দশ দশ বৎসরের জন্য হইত। তদনুসারে প্রজারা দশ বৎসর মালগুজারী করিতেন। তাহার পরে পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত হইত। ইজারা বন্দোবস্তের রীতি ছিল না, যে হেতু তাহাতে অধিক প্রজাপীড়ন হয় *।

মালগুজারী আদায়ের জন্য অনেক গুলিন লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারা এক এক জন এক ক্রোর ড্যাম, অর্থাৎ দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা, সংগ্রহ করিতেন, তজ্জন্য ইহাদিগের ক্রোরী উপাধি হইয়াছিল। প্রজারা তাঁহাদিগের স্থানে আপন২ মালগুজারী প্রদান করি-

* আকবরের মৃত্যুর পর ইজারা বন্দোবস্তের রীতি হইয়াছিল। সুবারা অত্যন্ত প্রজা পীড়ন করিতেন। তাহাতে রাজ্য ক্রমে নষ্ট হয়।

তেন, ইহাতে অধিক ব্যয় হইত না, এবং কোষভঙ্গ বা প্রতারণার তাদৃক আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু এ নিয়ম বহু-কাল ছিল না, কিছুদিনের পর তাহা রহিত হইয়া হিন্দু-দিগের প্রাচীন ধারাতে কর সংগ্রহ হইত।

যাহাহউক আকবর যে নিয়মে কর সংগ্রহ করিতেন তাহা অতি উত্তম। তোড়ল্মল ইহার মূলাধার, তিনি যুদ্ধ কর্ম্মে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, কর স্থাপন বিষয়েও তদ্রূপ বিচক্ষণ। আবলফজল লিখিয়াছেন তিনি জমিদারী কর্ম্মে অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহার আদর্শানুসারে রাজ্যের সকল স্থানে জরীপ ও জমাবন্দী এবং বৎসর২ জমী ও জমার কাগজ প্রস্তুত হইত, তাহাতে দর্পণের ন্যায় সকল বিষয় উত্তম রূপ বুঝা যাইত। ইহা দেখিয়া আর২ রাজারা ঐ ধারাতে আপনাপন রাজ্যের জমী জমার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, এবং এখন পর্য্যন্তও সেই ধারাক্রমে ভূসম্বন্ধীয় তাবৎ কর্ম্ম হইয়া আসিতেছে। তোড়ল্মল অতিশয় হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত ক্রূর স্বভাব ছিল, তজ্জন্য আকবরও কখন২ তাঁহাকে অনু-যোগ করিতেন। তোড়ল্মলের মৃত্যু হইলে আকবর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

সুবা।-আকবরের রাজত্ব কালে দিল্লী রাজ্য ১৫ সুবাতে*

---

* সুবার নাম—১ এলাহাবাদ, ২ আগ্রা, ৩ অযোধ্যা, ৪ আজমীর, ৫ গুজরাট, ৬ বেহার, ৭ বঙ্গভূমি, ৮ দিল্লী, ৯ কাবুল, ১০ লাহোর, ১১ মুলতান, ১২ মালব, ১৩ বেরার, ১৪ খন্দেশ, ১৫ আহম্মদ নগর।

বিভক্ত হইয়াছিল, পরে বিজয়পুর ও গোলকন্দা অধিকৃত হইলে আর ৩ নূতন সুবা হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ টা সুবা হইয়াছিল। ইহার এক এক সুবাতে এক এক রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন, ইহারা সুবার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু রাজার উপদেশ মত কর্ম্ম করিতে হইত। আকবরের রাজত্বকালে ইহাদিগের নাম সিপাসালার ছিল। পরে তাহাদিগের সুবাদার সংজ্ঞা হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের অধীনে এক এক জন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজস্ব সম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম করিতেন। করসংগ্রহকারী ও সেনাপতিরাও সুবাদারের অধীন থাকিতেন, করসংগ্রহকারেরা সুবাদারের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া কর সংগ্রহ করিতেন। সেনাপতিরা সেনার অধ্যক্ষতা করিতেন, বিদ্রোহাদি উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিতেন এবং যুদ্ধ কর্ম্মের জন্য যে সকল জায়গীর ছিল তাহার তদারক করিতেন।

বিচার।—বিচার সম্বন্ধীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য মির আদিল ও কাজী নামে দুই ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। কাজী অভিযোগ শুনিয়া ব্যবস্থা দিতেন, মির আদিল তাহা বিবেচনা করিয়া চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রদান করিতেন।

শান্তি রক্ষার কর্ম্ম কোতয়াল উপাধিক এক ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। সামান্য২ স্থানে কোতয়াল নিযুক্ত হইত না, রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরা ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। গ্রামের শান্তিরক্ষার কর্ম্ম গ্রামস্থ কর্ম্মকারক

দিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। এই সকল কর্ম্মকারকেরা কি ধারাতে কর্ম্ম করিতেন তাহা বিশেষ বর্ণন পাওয়া যায় না, কিন্তু আকবর গুজরাটের সুবাদারকে যে কয়েক পত্র লিখেন তাহাতে দেখাযায় শৃঙ্খলদ্বারা পদ বন্ধন, কশাঘাত, ও প্রাণদণ্ড একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কেবল রাজ-দ্রোহী হইলে প্রাণদণ্ড হইত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন অপ-রাধে প্রাণদণ্ড কর্ত্তব্য হইলে রাজার নিকটে সংবাদ যাইত, রাজা বিবেচনা করিয়া যেমন আজ্ঞা দিতেন সেই প্রকার দণ্ড বিধান হইত। কোন সুবাদার আপন ইচ্ছাতে কাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারিতেন না।

সৈন্য।—পূর্ব্বে সৈন্যগণকে রাজকোষ হইতে বেতন দেওনের রীতি ছিলনা, সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে জায়গীর দেওয়া যাইত, তাহার উপস্বত্ব হইতে তাঁহারা আপন আপন সৈন্যগণকে বেতন দিতেন। আবশ্যকমত খাজ-নাতেও সৈন্যদিগের বেতনের বরাত দেওয়া যাইত, সৈন্যেরা প্রজাদিগের স্থানে টাকা আদায় করিয়া লইত। কিন্তু উভয় মতে অনেক প্রতারণা ও অত্যাচার হইত। জায়গীরদারেরা বরাদ্দ মত সৈন্য রাখিতেন না, সৈন্য প্রদর্শন কালে আপনাদিগের ভৃত্য ও মুটিয়া মজুর ধরিয়া কোন প্রকারে সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিতেন। খাজ-নাতে বেতনের বরাত হইলে, সৈন্যেরা যথেচ্ছাক্রমে টাকা সংগ্রহ করিত, ইহাতে প্রজাপীড়নের একশেষ হইত।

আকবর খাজনাতে বেতনের বরাত না দিয়া রাজকোষ হইতে সৈন্যগণের বেতন দিবার নিয়ম করিলেন এবং জায়গীরদার দিগের ছল প্রতারণা না চলে, অর্থাৎ এক জনের বেতন আর এক জন না লয়, এজন্য সৈন্যগণের অবয়বের তালিকা করাইলেন, বেতন দান কালে তালিকার সহিত অবয়ব ঐক্য করিয়া বেতন দেওয়াইতেন। আর অশ্বারোহীরা প্রতারণা করিতে না পারে এজন্য প্রত্যেক অশ্বের গাত্রে ছাপ মারিয়া দেওয়াইলেন, সেই ছাপ দেখিয়া অশ্বারোহী দিগের বেতন দেওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন উষ্ট্র বলদ গাড়ি ও অন্য ২ যে সকল দ্রব্য সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন করিত তাহার ফর্দ্দ করাইলেন, সেই ফর্দ্দ দেখিয়া নির্দ্ধারিত হার অনুসারে ভাড়া দেওয়া যাইত, কেহ প্রতারণা করিতে পারিত না। এই সকল নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু পূর্ব্ব রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা প্রচলিত করাতে সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা ছিল, সৈন্যেরা তাহাতে অসম্মত হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে রাজ্য রক্ষা কঠিন হইত, কিন্তু আকবরের কৌশল ক্রমে তাহা ঘটিতে পারে নাই।

তৎকালে সৈন্যগণকে দলবদ্ধ করিবার রীতি ছিল না, এক এক জন প্রধান দশ অবধি দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সরকারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। ইহাদিগের নাম মনসবদার। ইহারা যিনি যত সেনার অধ্যক্ষ হইতেন তদনুসারে উপাধি পাইতেন, যিনি এক শত সৈন্যের

অধ্যক্ষ তাঁহাকে শতপতি, যিনি সহস্র সৈন্যের কর্তা তাঁহাকে সহস্রপতি বলাযাইত। দশ সহস্র সৈন্যের মন্সবদারী রাজপুত্র ভিন্ন প্রায় অন্য লোকে প্রাপ্ত হইতেন না। রাজকুটুম্ব ও রজঃপুত রাজারা পঞ্চসহস্রী সেনাপতি হইতেন; আর ২ মন্সবদারী অন্য লোককে দেওয়া যাইত। প্রত্যেক মন্সবদারকে অর্দ্ধেক অশ্বারোহী ও অর্দ্ধেক পদাতিক সেনা রাখিতে হইত। পদাতিকের মধ্যে চতুর্থাংশ বন্দুকধারী, অবশিষ্ট ধনুর্দ্ধর। এই সকল সেনা মন্সবদারদিগের অধীন থাকিয়া কর্ম্ম করিত, এবং তাহাদিগের বেতন মন্সবদারদিগকে দেওয়া যাইত। মন্সবদারদিগের প্রদত্ত অশ্বারোহী ভিন্ন আদি নামে আরো এক প্রকার অশ্বারোহী সেনা ছিল, ইহারা অতি বীর, গুণ বিবেচনায় ইহাদের বেতন ধার্য্য করা যাইত। বিশেষ যাহারা সিন্ধু পার হইতে আসিত তাহারা এক এক জন ২৫ মুদ্রা করিয়া পাইত, ভারতবর্ষীয়েরা ২০ করিয়া পাইত। যাহারা বন্দুক চালাইতে পারিত তাহারা ৬ টাকা, এবং তীরন্দাজেরা ২৷৹ টাকা করিয়া পাইত। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে রাজা সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন, মন্সবদারেরা * তাঁহার আজ্ঞাকারী

* মন্সবদারেরা অতি উচ্চ ২ বেতন পাইতেন, এবং উত্তম রূপে কর্ম্ম করিলে তাঁহাদের সন্তানেরা ঐ খ্যাতি ও সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। কাহার কাহার বৃত্তি বরাদ্দ হইত।

হইয়া কার্য্য করিতেন, এক এক যুদ্ধে ৩।৪ শত মন্সবদার নিযুক্ত থাকিতেন।

আকবরের রাজত্বকালে কত সৈন্য নিয়ত নিযুক্ত থাকিত তাহা কোন গ্রন্থে লেখে না। আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে দুই লক্ষ অশ্বারোহী সেনা, তদ্ভিন্ন অনেক অশিক্ষিত পদাতিক ও গোলন্দাজ নিযুক্ত ছিল। আকবরের সময় এত অধিক সেনা ছিল এমত বোধ হয় না।

অট্টালিকা।—অট্টালিকা নির্ম্মাণে আকবরের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সিন্ধুকূলে তিনি যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন তাহার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি আরো কয়েক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তন্মধ্যে আগ্রা ও এলাহাবাদের দুর্গ অতি উত্তম। এই দুই স্থানের প্রাচীর প্রস্তরময় এবং তাহার চতুর্দ্দিগে গভীর পরিখা, আর এই দুই স্থানে যে ফটক আছে তাহা অতি অপূর্ব্ব রাজালয়ের দ্বারের উপযুক্ত। আকবর ফতেপুর ও সিকরীতে সর্ব্বদা থাকিতেন, এজন্য ঐ স্থানও কিল্লাবন্দী করিয়া অতি সুশোভিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থান এক্ষণে প্রায় লোক-শূন্য হইয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

আইন আকবরী গ্রন্থে আকবরের আর২ তাবৎ কীর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে রাজভাণ্ডার অবধি রন্ধনশালার বিবরণ পর্য্যন্ত লেখা আছে, ইহার এক এক স্থানে কত দ্রব্য সামগ্রী ও লোক জন থাকিত ও কতই

জাঁকজমক ছিল তাহার বর্ণন করা বাহুল্য। টাকা জলের ন্যায় খরচ হইত, অথচ সকল বিষয়ের এমন বাঁধাবাঁধি ছিল তাহাতে এক কপর্দ্দকও অপব্যয় হইত না।

শিকার সজ্জা।—কোন ইংরাজ আকবরের সভাতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন আকবর যখন যুদ্ধে বা শিকারে * যাইতেন, তখন প্রায় ২॥০ ক্রোশ ভূমি কানাত দিয়া বেষ্টন করা যাইত, তাহার মধ্যে রাজা ও সভাসদ্‌গণের তাম্বু সারি২ পড়িত, এবং বাটীতে যে প্রকার প্রান্তরে সেই প্রকার রাজসভা, ভোজনালয়, নৃত্যালয়, শয়নালয় প্রস্তুত হইত। তাম্বুর ভিতর শাল বনাত মখমল কিংখাপ প্রভৃতি নানাপ্রকার উত্তম২ বস্ত্রে মণ্ডিত হইত। বহির্ভাগ লাল বসনে মোড়া যাইত। তাম্বুর চূড়াতে রূপার কলশ থাকিত। উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হইত নগর বসিয়া গিয়াছে, এবং সহরে যেমন রাস্তা ও গলি থাকে তাহার মধ্যে সকলি আছে।

জন্মতিথির ঘটা।—বৎসরের প্রথম দিবসে ও রাজার জন্মতিথির দিবসে বৎসর২ যে মহাসভা হইত, সেই সময়ে যৎপরোনাস্তি সমারোহ হইত। ঐ সময়ে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ভারি মেলা বসিত, এবং রঙ্গ সঙ্গ তামাশা নানা-

* আকবরের অশ্বালয়ে ১২০০০ অশ্ব এবং হস্তিশালে ৫০০০ হস্তী সর্ব্বদা বাঁধা থাকিত, ইহা ভিন্ন শিকারের দ্রব্যাদি কত ছিল তাহা নির্ণয় করিয়া লেখা যায় না।

প্রকার হইত। রাজার তাম্বু মধ্যস্থলে পড়িত, তাহার চতুর্দ্দিকে পাঁচ ছয় বিঘা ভূমি ঘেরিয়া সভা সাজান যাইত, তাহার চতুর্দ্দিক স্বর্ণ ও বহুমূল্য রত্ন বিভূষিত মখমলে মণ্ডিত হইত। চন্দ্রাতপ নক্ষত্রের ন্যায় মণিতে সুশোভিত হইত, তাহার ঝালরে মুক্তাশ্রেণী ঝুলিত। ভূমিতে গালিচা ছুলিচা ও কিংখাপ পাতা যাইত। তাহার উপর মছলন্দ পড়িত। রাজসভাসদ্‌গণের স্বতন্ত্র ২ তাম্বু পড়িত। সভারম্ভে রাজার তুলা হইত, স্বর্ণের দাঁড়ি পাল্লা খাটাইয়া তিনি এক দিকে বসিতেন, অন্য দিকে হেম রজত রত্ন সুবাস ও আর২ বহুমূল্য দ্রব্য ঢেরি করিয়া দিত, তুলার পর এই সকল দ্রব্য বিতরণ হইত। তৎপরে রাজা স্বর্ণ ও রূপার বাদাম ও অন্য ২ ফল মুষ্টি ২ করিয়া ছড়াইয়া দিতেন, সভাসদ্‌গণ তাহা কুড়াইয়া লইতেন। ইহার পরে রাজা সভাসদ্‌গণকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, হয়, হস্তি ও বহুমূল্য রত্নাদি দান করিতেন। পর্ব্বের দিবস রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌গণ মণি মুক্তায় ভূষিত ও ক্রৌঞ্চপুচ্ছ দ্বারা শিরঃ শোভা করিয়া সভাতে বসিতেন, সভার অনুপম শোভা হইত। এই সভার সম্মুখ দিয়া শত ২ হস্তী যূথবদ্ধ হইয়া গমন করিত, হস্তিসজ্জা অতি আশ্চর্য্য, প্রতি সম্প্রদায়ের প্রথম হস্তির মুণ্ড ও বক্ষোদেশ মণি মুক্তা যুক্ত স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত হইত। এক ২ হস্তির সজ্জা এক ২ জন মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য। হস্তিযাত্রার পর শত শত সুস-

জীভূত তুরঙ্গ সেই প্রকার গমন করিত। তৎপরে গণ্ডার সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, শিকারী কুক্কুর ও বাজপক্ষী সারি২ লইয়া যাইত। অবশেষে অশ্বারোহী সেনাগণ সভার সম্মুখ দিয়া গমন করিত, এই সেনা কত যাইত তাহার সংখ্যা ছিলনা। এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সজ্জা কেমন উত্তম তাহা বর্ণনাতীত।

এই ঘটার সভাতে আকবরের কিছুমাত্র বেশের ছটা ছিল না, তিনি সহজ বেশে সিংহাসনে বসিতেন, কতক গুলা মণি মুক্তা পরিয়া অঙ্গ শোভা করিতেন না। দুই জন ইংরাজ তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা লিখিয়াছেন তিনি বিচারকালে সিংহাসনে উপবেশন না করিয়া তন্নিম্নভাগে উপবেশন করিতেন, কখন কাহাকেও উচ্চ বাক্য কহিতেন না, সকলের সঙ্গে সদালাপ করিতেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে সকল প্রজা সুখী হইয়াছিল।

বিংশ অধ্যায়

জাহাঙ্গীর।

সলীম, জাহাঙ্গীর অর্থাৎ পৃথ্বীজয়ী নাম ধারণ পূর্ব্বক

হিং ১০১৪
খৃ ১৬০৫ অক্টবর ১৩
কং ৪৭০৭ আশ্বিন

সিংহাসন আরোহণ করিয়া, পিতার নিয়োজিত কর্ম্মকারীদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে স্থিরতর রাখিলেন। তিনি আরো কয়েক কর্ম্ম করিলেন তাহাও উত্তম। বিশেষতঃ পথিক ও মহাজন দিগকে নানা প্রকার শুল্ক দান করিতে হইত, আকবর তাহার অনেক রহিত করিয়াছিলেন, যাহা অবশিষ্ট ছিল তিনি তাহাও উঠাইয়া দিলেন। রাজসম্পর্কীয় লোকেরা বণিকদিগের বাণিজ্য দ্রব্যাদি খুলিয়া দেখিত, এবং রাজ-সৈন্য ও রাজকিঙ্করেরা যাহার তাহার বাটীতে যাইয়া বলপূর্ব্বক বাসা করিত, গৃহস্থেরা স্থানাভাবে ক্লেশ পাইত। জাহাঙ্গীর এই সকল দৌরাত্ম্য একেবারে নিবারণ করিয়া দিলেন। নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দণ্ড বিধানের যে কুরীতি ছিল তাহা রহিত করিলেন, মদ্যপান * একেবারে নিষেধ, এবং অহিফেন ভক্ষণের নিয়ম নির্দ্ধারিত

* জাহাঙ্গীর এই আজ্ঞা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু আপনি মদ্য-পান ত্যাগ করেন নাই।

করিয়া দিলেন। অধিকন্তু সকল প্রজা রাজার নিকটে যাইয়া আপন ২ দুঃখ জানাইতে পারে এজন্য তিনি আপনার বসিবার গৃহে কতক গুলা স্বর্ণময় ঘন্টা টাঙ্গাইয়া তাহাতে এক গাছা শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া বাহিরে ঝুলাইয়া দেওয়াইলেন, যাহার রাজসাক্ষাৎ আবশ্যক হইত শৃঙ্খল ধরিয়া নাড়িত, ঘন্টা বাজিয়া উঠিলে তাহাকে ডাকাইয়া তাহার কথা শুনিতেন।

রাজপুত্র খসরু পূর্ব্বাবধি পিতার অপ্রিয় হইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, রাজনন্দন বন্দীর ন্যায় থাকিতেন। এক দিবস জাহাঙ্গীর নিদ্রা যাইতেছেন, কিঙ্করগণ সংবাদ দিল, রাজপুত্র কতকগুলি বয়স্য সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিতেছেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কতকগুলা অশ্বারোহ সেনা তাঁহার অন্বেষণে পাঠাইলেন, পরে প্রাতঃকালে যত সৈন্য একত্র করিতে পারিলেন তাহা লইয়া আপনি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন।

হিং ১১৪
খৃ ১৬০৬। মার্চ।

রাজপুত্র রাজালয় পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ ও দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে পঞ্জাবাভিমুখে চলিলেন। এই ভাবে যখন লাহোরে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার সঙ্গে দশ সহস্র লোক মিলিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের অগ্রগামী সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ ২ লাহোরে উপস্থিত হইলে রাজকুমার তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে

বিংশ অধ্যায়

জাহাঙ্গীর।

সলীম, জাহাঙ্গীর অর্থাৎ পৃথ্বীজয়ী নাম ধারণ পূর্ব্বক

হিং ১০১৪
খৃ ১৬০৫ অক্টবর ১৩
কং ৪৭০৭ আশ্বিন

সিংহাসন আরোহণ করিয়া, পিতার নিয়োজিত কর্ম্মকারীদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে স্থিরতর রাখিলেন। তিনি আরো কয়েক কর্ম্ম করিলেন তাহাও উত্তম। বিশেষতঃ পথিক ও মহাজন দিগকে নানা প্রকার শুল্ক দান করিতে হইত, আকবর তাহার অনেক রহিত করিয়াছিলেন, যাহা অবশিষ্ট ছিল তিনি তাহাও উঠাইয়া দিলেন। রাজসম্পর্কীয় লোকেরা বণিকদিগের বাণিজ্য দ্রব্যাদি খুলিয়া দেখিত, এবং রাজ-সৈন্য ও রাজকিঙ্করেরা যাহার তাহার বাটীতে যাইয়া বলপূর্ব্বক বাসা করিত, গৃহস্থেরা স্থানাভাবে ক্লেশ পাইত। জাহাঙ্গীর এই সকল দৌরাত্ম্য একেবারে নিবারণ করিয়া দিলেন। নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দণ্ড বিধানের যে কুরীতি ছিল তাহা রহিত করিলেন, মদ্যপান * একেবারে নিষেধ, এবং অহিফেন ভক্ষণের নিয়ম নির্দ্ধারিত

* জাহাঙ্গীর এই আজ্ঞা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু আপনি মদ্য-পান ত্যাগ করেন নাই।

করিয়া দিলেন। অধিকন্তু সকল প্রজা রাজার নিকটে যাইয়া আপন ২ দুঃখ জানাইতে পারে এজন্য তিনি আপনার বসিবার গৃহে কতক গুলা স্বর্ণময় ঘন্টা টাঙ্গাইয়া তাহাতে এক গাছা শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া বাহিরে ঝুলাইয়া দেওয়াইলেন, যাহার রাজসাক্ষাৎ আবশ্যক হইত শৃঙ্খল ধরিয়া নাড়িত, ঘন্টা বাজিয়া উঠিলে তাহাকে ডাকাইয়া তাহার কথা শুনিতেন।

রাজপুত্র খসরু পূর্ব্বাবধি পিতার অপ্রিয় হইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, রাজনন্দন বন্দীর ন্যায় থাকিতেন। এক দিবস জাহাঙ্গীর নিদ্রা যাইতেছেন, কিঙ্করগণ সংবাদ দিল, রাজপুত্র কতকগুলি বয়স্য সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিতেছেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কতকগুলা অশ্বারোহ সেনা তাঁহার অন্বেষণে পাঠাইলেন, পরে প্রাতঃকালে যত সৈন্য একত্র করিতে পারিলেন তাহা লইয়া আপনি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন।

হিং ১১৪
খৃ ১৬০৬। মার্চ।

রাজপুত্র রাজালয় পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ ও দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে পঞ্জাবাভিমুখে চলিলেন। এই ভাবে যখন লাহোরে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার সঙ্গে দশ সহস্র লোক মিলিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের অগ্রগামী সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ ২ লাহোরে উপস্থিত হইলে রাজকুমার তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে

পরাস্ত হইয়া কাবুলে পলায়নের বাঞ্ছায় সিন্ধু পার হইতে লাগিলেন, হঠাৎ নৌকা চড়াতে বসিয়া গেল, তাহাতে পার হইতে পারিলেন না। জাহাঙ্গীরের সেনাগণ তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া আনিল। খসরুর প্রতি জাহাঙ্গীরের যে ভাব ছিল তাহা অবিদিত নাই, তথাচ পুত্র বলিয়া তিনি তাহার প্রাণ বধ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সকল কুসঙ্গী মিলিয়াছিল তাহাদিগের সাত শত জনকে লাহোর ও কাবুলের দ্বারের দুই পাশে সারি২ দাঁড় করাইয়া প্রাচীরের সঙ্গে পেরেক মারিয়া দিলেন, তাহারা বার খাড়ার ন্যায় দ্বারে দাঁড়াইল। খসরুকে গজপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া তাহার মধ্যদিয়া লইয়া গেলেন, তাঁহার অগ্রে২ এক পদাতিক এই কথা বলিতে২ চলিল, মহারাজ এই সকল লোকেরা তোমার শুভানুধ্যায়ী, ইহারা তোমার অভ্যর্থন জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে ইহাদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ কর।

খসরু অপমানে মৃতপ্রায় হইলেন, তিন দিবস জলস্পর্শ করিলেন না। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং এই অবস্থাতে তাঁহাকে কাবুলে লইয়া গেলেন। কাবুলে যাইয়া তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করাইয়া তাঁহাকে দুর্গের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে আরো অনুগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার কয়েক জন পারিষদ মন্ত্রণা করিল জাহাঙ্গীরকে বধ করিয়া খসরুকে রাজা দিবে। জাহাঙ্গীর তাহা

জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তদবধি আর বাহির হইতে দিতেন না।

জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভের কিছু দিবস পরে উদয়পুরের রাজার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। পরবেজ নামে জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র ঐ যুদ্ধে যাইয়া উদয়পুরের রাজার সহিত একটা সৎসন্ধি করিবার উদ্যোগে ছিলেন, ইতিমধ্যে খসরু পলায়ন করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে আপনার নিকটে আনাইলেন, সুতরাং সেই সন্ধি হইল না। পর বৎসর জাহাঙ্গীর কাবুল হইতে প্রত্যাগমন

হিং ১০১৬ }
খৃ ১৩০৭ }

করিয়া মহব্বত খাঁ নামে এক প্রধান সেনাপতিকে উদয়পুরে প্রেরণ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে দক্ষিণ রাজ্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। তন্নিবারণ জন্য জাহাঙ্গীর, খাঁ খানানকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তিনি দক্ষিণ রাজ্যে যাইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধ জয় করিতে পারিলেন না। মালক আম্বর নামে তত্রস্থ রাজমন্ত্রী আহম্মদ নগর অধিকার করিয়া মোগলসেনাপতিকে ঐ রাজ্য হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া দিলেন।

হিং ১০২০ অব্দে জাহাঙ্গীর ভুবনবিখ্যাত নুরজাহানের পাণিগ্রহণ করেন।* নুরজাহান অতি রূপবতী ছিলেন।

---

* ইহাঁর পূর্ব্ব নাম আমীরুন্নিশা, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নুরজাহান অর্থাৎ জগজ্জ্যোতি নাম দিয়াছিলেন, তিনি এই নামে খ্যাত, অতএব অন্য নাম লেখা গেল না।

তত্তুল্য সুন্দরী তৎকালে এতদ্দেশে আর ছিল না। জাহাঙ্গীর অনেক দিবসাবধি তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার জন্য যে সকল কুকাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা রাজার অনুচিত কর্ম্ম। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে,

নুরজাহান খাজা আইয়াসের কন্যা। খাজা আইয়াস পারসস্থানের অন্তঃপাতি তেহরাণে বাস করিতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান এবং নানাগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাদৃক্ ধন বা সম্পত্তি ছিল না। অতএব স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে আসিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন এই বাসনায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও দুইটী পুত্র লইয়া এতদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী। সম্পত্তির মধ্যে কয়েকটী মুদ্রা ও একটী সামান্য ঘোটক ছিল। ঐ ঘোটকে ভার্য্যাকে আরোহণ করাইয়া আপনি দুইটী পুত্র লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। কতক দুর আসিয়া তাঁহার পথসম্বল ফুরাইল, তখন অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষায় নির্ভর করিয়া আসিতে লাগিলেন। কান্ধার পরিত্যাগ করিয়া যখন প্রান্তরে পড়িলেন তখন সে আশাও দুর হইল, ঐ স্থানে মনুষ্যের গমনাগমন প্রায় হয় না এবং চতুর্দ্দিগে মরুভূমি, কোন্ স্থানে জল ফল ছিল না যে তদ্দ্বারা প্রাণধারণ করেন।

এই দুঃসময়ে তাঁহার পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া একটী কন্যা জন্মিল। এই কন্যার নাম নুরজাহান, তাহার রূপে মরুভূমি উজ্জ্বল করিল, কিন্তু আপনারা

ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কাতর, চলৎ শক্তি রহিত প্রায়, কন্যাকে কি প্রকারে লইয়া যান এই ভাবিয়া কন্যাটীকে পত্রাচ্ছাদন করিয়া এক বৃক্ষমূলে রাখিয়া, আপনারা যেমন গমন করিতে ছিলেন সেই প্রকার চলিলেন।

কতক দূর আসিয়া তাঁহার ভার্য্যা কন্যার শোকে অধৈর্য্যা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। খাজা আইয়াস উঁাহাকে কোন প্রকারে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া কন্যাটীকে আনয়ন করিতে গেলেন। গিয়া দেখেন এক কাল ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। খাজা আইয়াস তাহা দেখিয়া দূর হইতে চীৎকার ও প্রস্তরাদি নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সর্প কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এক গর্ত্তে প্রবেশ করিল। খাজা আইয়াস তখন কন্যাকে লইয়া ভার্য্যার ক্রোড়ে দিলেন। তাঁহার ভার্য্যা কন্যাকে পাইয়া ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

পরদিন কতকগুলিন যাত্রী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তন্মধ্যে একজন বণিক ছিলেন। তিনি তাহাদিগের দুর্গতি দেখিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লাহোরে আনিলেন। তৎকালে আকবর ঐ স্থানে ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী খাজা আইয়াসের কেমন কুটুম্ব ছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন, পরে রাজার সঙ্গে তাঁহার আলাপ করিয়া দিলেন। আকবর তাঁহার চতুরতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে সহস্র অশ্বাধিপতি, তৎ-

পরে রাজকোষাধ্যক্ষ, করিলেন। খাজা আইয়াস যেমন সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান তদুপযুক্ত কর্ম্ম পাইলেন।

খাজা আইয়াস বাল্যকালাবধি কন্যাকে নানাপ্রকার বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন, নুরজাহান সেই সকল বিদ্যা উত্তম রূপে শিখিলেন, সুতরাং তিনি যেমন রূপবতী সেইপ্রকার গুণবতীও হইলেন। তাঁহার তুল্য নারী তৎকালে আর রহিল না, তিনি রূপে গুণে অদ্বিতীয়া হইলেন।

নুরজাহানের গর্ভধারিণী রাজার অন্তঃপুরে গমনাগমন করিতেন, মধ্যে২ নুরজাহানও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। তাহাতে রাজপুত্র সলীম তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে নিতান্ত বিচলিতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানস করিলেন। এই কথা ক্রমে আকবরের কর্ণগোচর হইল। কিন্তু সের আফগান নামে পারসস্থানবাসী এক যুবার সহিত নুরজাহানের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা রহিত করিয়া পুত্রের সহিত বিবাহ দিলে অযশের ভাগী হইতে হয়, এজন্য আকবর তাহা না করিয়া সের আফগানের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়াইলেন, এবং তাহার ভরণ পোষণ জন্য বঙ্গদেশে বৃত্তি নিয়োজিত করিয়া দিলেন। সের আফগান নুরজাহানকে লইয়া বর্দ্ধমানে বাস করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর পিতার ভয়ে তখন কিছু করিতে পারিলেন না, মনের মানস মনেতেই রাখিলেন। পিতার মৃত্যুর

পর রাজ্যেশ্বর হইয়া তিনি সের আফগানকে নানা-প্রকার লোভ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকে স্ত্রীদান করিয়া কে কোথায় লোভ সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। সের আফগান তাহাতে ভুলিলেন না। অতএব সে আশায় নিরাশ হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহাকে বর্দ্ধমান হইতে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক রাখিলেন। সরলস্বভাব সের আফগান তাঁহার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্তর জাহাঙ্গীর এক দিবস তাঁহাকে লইয়া শীকারে গমন করিলেন, এবং একটা বৃহৎ ব্যাঘ্রকে ঘেরিয়া সঙ্গী-গণকে বলিলেন এই ব্যাঘ্রের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করিতে পারে তোমাদের মধ্যে এমত বীর পুরুষ কেহ আছে কি না। এই কথায় তিন ব্যক্তি সুসজ্জিত হইয়া দাণ্ডাইলেন। সের বীরাগ্রগণ্য এবং সতত যশঃপ্রয়াসী ছিলেন, অপরে ব্যাঘ্র বধ করিলে তাঁহার যশ লাভ হয় না, এই ভাবিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন মহারাজ ইহারা অস্ত্রাদি লইয়া ব্যা-ঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কি আশ্চর্য্য, পরমেশ্বর পশ্বাদিকে যেমন হস্ত পদ ও দন্তাদি দিয়াছেন মনুষ্যকে সেইপ্রকার হস্ত পদাদি দিয়াছেন, অধিকন্তু মনু-ষ্যকে বুদ্ধিবল দিয়াছেন, পশুগণ তাহাতে বঞ্চিত, অতএব অস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করা পৌরুষের নহে। যদি নিরস্ত্র হইয়া কেহ ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে করুক, নতুবা আমি নিরস্ত্র হইয়া যুদ্ধ করিব। জাহাঙ্গীর এই কথায় মনেং

সন্তুষ্ট হইয়া তখনি অনুমতি দিলেন। দুই একবার বারণ করিলেন কিন্তু সে মৌখিক। সের নিরস্ত্র হইয়া ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মুখের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া তাহার জিহ্বা টানিয়া ধরিলেন, ব্যাঘ্রের বিক্রম রহিলনা, তাহার পর সের আফগান তাহাকে অনায়াসে বধ করিলেন *।

এই সাহস দেখিয়া সকলে সেরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের মানোভিলাষ পূর্ণ হইল না, অতএব তিনি তাঁহাকে বিনাশ করিবার আর এক উপায় করিলেন। সে উপায় এই, তাঁহার একটা মত্ত মাতঙ্গ ছিল, তাহার মাহুতকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন যখন সের আফ-গান রাজপুরী হইতে বাসাতে যাইবেন তখন হাতিকে লইয়া তাহার উপরে চাপাইয়া দিবে। হস্তিপ এই আজ্ঞা পাইয়া হস্তীকে প্রস্তুত করিয়া রাখিল। পরে যখন সের আফগান পালকী আরোহণে রাজালয় হইতে বাহির হইয়া একটা গলিতে প্রবেশ করিলেন, তখন হস্তিপ মত্ত হস্তীকে তাঁহার পালকীর উপর চাপাইয়া দিল। কাহা-রেরা পালকী ফেলিয়া পলায়ন করিল। সের তাহা দেখিয়া পালকী হইতে নামিয়া হস্তীর শুণ্ডে এমত খড়্গা-ঘাত করিলেন যে তাহাতে হস্তীর শুণ্ড একেবারে দুই

* তিনি পূর্ব্বে একটা ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার সের নাম হইয়াছিল। সের শব্দের অর্থ ব্যাঘ্র।

খণ্ড হইয়া পড়িল। হস্তীর পো চীৎকার করিতে২ বেগে পলায়ন করিল।

জাহাঙ্গীরের এই সকল কুমন্ত্রণা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সের আফগান তাহা জানিতে পারিয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া রাজমহলে আসিয়া বাস করিলেন। ইহাতেও জাহাঙ্গীর ক্ষান্ত হইলেন না। কুতবুদ্দীন নামে তাঁহার মাতার এক পালক পুত্রকে বঙ্গদেশের সুবাদারী দিয়া আজ্ঞা করিলেন যেপ্রকারে হয় সের আফগানকে বধ করিবে। কুতব এই আজ্ঞা পাইয়া চল্লিশ জন দস্যু নিযুক্ত করিলেন, ইহারা অঙ্গীকার করিল সের আফগানকে বধ করিবে। সের আফগান অতি বলবান্ ছিলেন, রাত্রে কাহাকে বাটীর মধ্যে থাকিতে দিতেন না, কেবল একজন প্রাচীন দ্বারবান্ দ্বারে থাকিত। এক দিবস সন্ধ্যাকালে ঐ দ্বারবান্ স্থানান্তরে গমন করিলে দস্যুগণ চুপে২ বাটী প্রবেশ করিয়া গোপন ভাবে থাকিল। সের আফগান নিদ্রিত হইলে, দস্যুগণ তাঁহার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল, ঐ সময়ে তাহাদের মধ্যে একজন প্রাচীন বলিল অরে ভাই শুনদেখি, একজন নিদ্রিত ব্যক্তির উপরে আমরা চল্লিশ জন একেবারে পড়িব ইহাকি ধর্ম্মের কর্ম্ম। নিদ্রিত মনুষ্যকে মারা অকর্ত্তব্য, নিদ্রিত মনুষ্য মৃতের তুল্য। এই কথায় সের আফগানের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে শয়নালয়ের

এক কোণে দাড়াইলেন। দস্যুগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অস্ত্রাঘাত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যাইতে পারিল না। সের আফগান ক্ষণেক কালের মধ্যে অনেককে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত করিয়া দিলেন। দস্যুগণ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল।

এই ব্যাপারের পর সের আফগান বিবেচনা করিলেন রাজমহলে বাস করা আর কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কুতবুদ্দিন ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বর্দ্ধমানে কর্ম্ম কার্য্যের তত্ত্বাবধান ছলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় আসিলেন। সের আফগান তাঁহার অভিপ্রায় কতক বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না। অনন্তর যখন কুতব বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন তখন সের আফগান অশ্বারোহণে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল দুইজন অশ্বারোহী ভৃত্য গমন করিল। সের উপস্থিত হইলে কুতব তাঁহার সঙ্গে সদালাপ করিতে ২ চলিলেন। কতক দূর আসিয়া নগর দর্শনে যাইবেন এই ছলে কুতব হস্তী আনিতে আজ্ঞা দিলেন। হস্তী আনয়ন করিলে যখন তিনি তাহাতে আরোহণ করেন তখন সের আফগান অশ্বারোহণে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন। ঐ সময়ে কুতবের একজন দেহরক্ষক সেনা পথ ছাড় বলিয়া তাঁহাকে এমত বর্ষাঘাত করিল যে তাহাতে তিনি অশ্ব হইতে ভূমিতে পড়িলেন। ঐ সময়ে কুতবের

আর ২ লোকেরা বর্ষা বন্দুক লইয়া প্রস্তুত হইল। সের বুঝিতে পারিলেন গতিক ভাল নহে, অতএব অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক কুতবের হস্তিপার্শ্বে যাইয়া একাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। কুতবের লোকেরা শস্ত্রপাণি হইয়া তাঁহার চারিদিগ বেষ্টন করিল। চারিদিগ হইতে বল্লম বর্ষা তীর ও গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। সের শত্রুজালে বেষ্টিত হইয়া এমন ভাবে অশ্ব ও অস্ত্র চালুন করিতে লাগিলেন কোন ব্যক্তি তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না। যে ব্যক্তি নিকট আসিবার চেষ্টা করিল সে তখনি সেই খানে শয়ন করিল। সেরের চতুর্দ্দিগে শরের ঢেরি হইল। তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অতঃপর একটা গুলি আসিয়া তাঁহার অশ্বের মস্তক ভেদ করিল, ঐ গুলি খাইয়া অশ্ব ধরাবলুণ্ঠিত হইল। তখন সের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক মক্কাস্য হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং বারি অভাবে একমুষ্টি মৃত্তিকা মস্তকে অর্পণ করিয়া ঈশ্বর স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখনও কেহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। একে একে তাঁহার শরীরে ছয়টা বন্দুকের গুলি প্রবেশ করিল, তাহাতে তিনি ক্রমে হীনবল হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। তৎপরে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। সের আফগান এই প্রকার মহাবীর ছিলেন। সকল ইতিহাসলেখক তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।

সের আফগানের মৃত্যুর পর কুতবের পারিষদ লোকেরা তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল, এবং নুরজাহানকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়াদিল। নুরজাহান দিল্লীতে আনীত হইলে জাঁহাঙ্গীর তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিলেন, কিন্তু নুরজাহান তাঁহাকে স্বামিহন্তা বলিয়া পাণিদানে সম্মত হইলেন না। জাহাঙ্গীর বল প্রকাশ করিলে করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া নুরজাহানকে স্বীয় গর্ভধারিণীর নিকটে বন্দিনী করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াদিলেন। এই বিপরীত ভাবের প্রকৃত কারণ এপর্য্যন্ত কেহ অনুভব করিতে পারেন নাই; বোধ হয় পরস্ত্রী হরণ জন্য যে সকল জঘন্য কাণ্ড করিয়া ছিলেন তাহাতে মনে২ লজ্জা হইয়া থাকিবে, তাহাতেই ক্ষান্ত হইলেন।

নুরজাহান প্রায় চারি বৎসর সামান্য বন্দিনীর ন্যায় রাজান্তঃপুরে থাকিলেন। তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের কোন উপায় ছিল না, এজন্য তিনি চিত্র লিখিয়া বিক্রয় করাইতেন, তাহাতে ব্যয় বিধান হইত। ক্রমে তাঁহার চিত্র ও শিল্পকর্ম্মের অতিশয় গৌরব হইল, রাজা তাহাতে পুনর্ব্বার তাঁহার প্রণয়াভিলাষী হইলেন। নুরজাহান তখন রাজরাণী হইবার অভিলাষে পাণিদান করিলেন। বিবাহে অত্যন্ত সমারোহ এবং ঘটা হইল। তৎপরে নুরজাহান রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন, তাঁহার পিতা রাজমন্ত্রী, এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যের অতি উচ্চ

কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত স্বর্ণমুদ্রাতে অঙ্কিত হইতে লাগিল। তাঁহার আধিপত্যের সীমা পরিসীমা থাকিল না। জাহাঙ্গীর তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিতেন না, তিনি যাহা বলিতেন তাহা বেদবাক্যের ন্যায় মানিতেন।

এই প্রকার নারীভক্তি নিন্দনীয় বটে, কিন্তু নুরজাহান প্রথম ২ যে ২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহাতে রাজ্যের হিত ভিন্ন কিছুই অহিত হয় নাই। তাঁহার পিতা যিনি রাজমন্ত্রী হইয়াছিলেন তিনি অতি জ্ঞানবান্ ও নিরাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার ভ্রাতাও অতি পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা রাজ্যের অনেক মঙ্গল হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরেরও অনেক দুর্নীতি ছিল, তিনি মদ্য পান করিয়া সামান্য মদ্যপের ন্যায় যথাতথা পড়িয়া থাকিতেন, এবং লোকের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার করিতেন। নুরজাহান এই সকল দুর্নীতি দূর করিলেন। জাহাঙ্গীর অপরিমিত পান ত্যাগ করিয়া শয়নাগার ভিন্ন অন্য স্থানে মদ্যপান করিতেন না, এবং লোকের সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

নুরজাহানের যেমন রূপ ও গুণ, বুদ্ধি ও ক্ষমতা সেই প্রকার ছিল, তদ্দ্বারা তিনি রাজকর্ম্ম উত্তমরূপে চালাইতে লাগিলেন। বিশেষ, গৃহসজ্জায় তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল, তিনি পুরাতন গঠনের দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে নূতন গঠনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইলেন, ইহাতে রাজসভার এমন

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইল যে তত্তুল্য শোভা পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় অনেক ন্যূন হইল। অপর তৎকালে স্ত্রী জাতিরা যেপ্রকার বসনাদি পরিধান করিতেন তাহা উত্তম ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে তিনি বাইআনা পোশাকের সৃষ্টি করিলেন, সেই পোশাক অদ্যাপি ব্যবহার হইতেছে। তদ্ভিন্ন এইক্ষণে যে গোলাপি আতর * ব্যবহার করা যায় তাহাও নুরজাহান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। নুরজাহানের বিদ্যাও যৎসামান্য ছিলনা, তিনি মুখেং কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কথিত আছে এই গুণে জাহাঙ্গীর তাঁহার অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছিলেন।

রাজার বিবাহের কিছুকাল পরে রাজবিদ্রোহী ওসমান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মরিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের উপদ্রবে শান্তিজল পড়িল। কিন্তু দক্ষিণ রাজ্যে ঘোরতর গোলযোগ বৃদ্ধি হইল,

হিং ১০২১
খৃ ১৬১২

ঐ রাজ্য পুনর্জয়ের কল্পনায় এইরূপ ধার্য্য হইল, গুজরাট হইতে একদল এবং বেরার হইতে আর একদল সেনা একেবারে ঐ দেশ আক্রমণ করিবে। তাহা হইলে মলকাম্বর রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু মলকাম্বর চতুরতা পূর্ব্বক উত্তরে কতগুলিন অশ্বারোহি সেনা রাখিয়া দিলেন, গুজরাট হইতে রাজসেনা যেমন আসিতে

* এই আতরের তরি পূর্ব্বে ৮০ টাকা ছিল। এইক্ষণে তাহা প্রস্তুত করার ধারা আরো ভাল হইয়াছে, অতএব তাহার মূল্যও কমিয়া আসিয়াছে।

লাগিল, তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল, এবং তাহাদের বাট ঘাট বন্ধ করিল। গুজরাটী সেনাদিগের আহারাদির মহা কষ্ট হইতে লাগিল, তাহাতে তাহারা তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। বেরার হইতে যে সকল সেনা আসিয়াছিল তাহারা গুজরাটী সেনাদিগের ঐ দুর্দ্দশা দেখিয়া রণে ক্ষান্ত দিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল। সুতরাং দক্ষিণ রাজ্য পুনর্জ্জয়ের কল্পনা বৃথা হইল। তাহা মলকাম্বরের হস্তে রহিল।

উদয়পুরের যুদ্ধ পূর্ব্বাবধি চলিতেছিল। মহব্বত খাঁ ও আবদুল্লা এই যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাকার রাণা দুর্গম স্থানে পলায়ন করাতে সুতরাং যুদ্ধের প্রকৃত ফল দর্শে নাই, অতএব জাহাঙ্গীর করম নামে তাঁহার পরম প্রিয় তৃতীয় পুত্রকে বিংশতি সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে তথায় পাঠাইলেন। রাজপুত্র আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া রাণাকে নানাপ্রকার কষ্ট দিতে লাগিলেন। রাণা বিব্রত হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং সন্ধির প্রার্থনায় নানাজাতীয় উপঢৌকন লইয়া রাজপুত্রের সভাতে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র, পিতামহ আকবরের রীত্যনুসারে, তাঁহাকে আলিঙ্গনাদি করিয়া আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর তাঁহার যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন সমুদয় প্রত্যর্পণ

হি ১০২৩
খৃ ১৬১৩

পূর্ব্বক তাঁহার পুত্রকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করাইলেন।

এই কর্ম্মে করমের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা হইল। বিশেষ তিনি যেমন পিতার প্রিয়, নুরজাহানের ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহারও সেইরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, রাজরাণী সর্ব্বদা তাঁহার ইষ্ট ইচ্ছা করিতেন। অতএব জাহাঙ্গীর তাঁহাকে সাহজাহান, অর্থাৎ পৃথ্বীরাজ, উপাধি দিয়া দক্ষিণ দেশের যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে তিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইল, সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুর * রাজ্যাশা একেবারে শেষ হইল এবং তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা পরবেজের যে যৎকিঞ্চিৎ আশা ভরসা হইয়াছিল তাহাও রহিল না।

সাহজাহানের কেমন শুভাদৃষ্ট, দক্ষিণ রাজ্যে গমন মাত্রেই, মলকাম্বরের সেনাপতি ও সুহৃদ সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। মলকাম্বর হতবল হইয়া দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আহম্মদনগর প্রভৃতি যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন তাবৎ প্রত্যর্পণ করিলেন। তদবধি ঐ রাজ্যে শান্তিস্থাপন হইল। চারি বৎসর পর্য্যন্ত আর কোন গোলযোগ রহিল না। পঞ্চম বৎসরে মলকাম্বর পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মোগলদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া ঐ দেশ আপনি পুনরধিকার করি-

* তিনি তখন পর্য্যন্তও কারারুদ্ধ ছিলেন।

লেন। তখন সাহজাহানকে ঐ রাজ্যে পুনঃ প্রেরণ করা

হি ১০৩০ | খৃ ১৬২১

নিতান্ত আবশ্যক হইল। কিন্তু সাহজাহানের অন্তঃকরণে কেমন সন্দেহ জন্মিয়াছিল তিনি বক্র হইয়া বসিলেন, বলিলেন খসরু তাঁহার হস্তে থাকিবে, ইহা হইলে তিনি যুদ্ধে গমন করিবেন, নতুবা করিবেন না। জাহাঙ্গীর কি করেন তাহাই স্বীকার করিয়া খসরুকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। সাহজাহান তাহাকে লইয়া দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তৎপরে মলকাম্বরের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ হইল। অনেক যুদ্ধের পর সাহজাহান তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন।

ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীরের শ্বাস কাশ অতি প্রবল হইয়া প্রাণ বিয়োগের লক্ষণ হইল। পরবেজ এই সংবাদে রাজ্যাশায় রাজধানীতে আসিলেন, কিন্তু আগমন মাত্র জাহাঙ্গীর তাঁহাকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ সময়ে খসরুর মৃত্যুসংবাদ আসিল। কেহ২ অনুমান করেন তিনি সাহজাহানের রাজ্যপ্রাপ্তির পথে কন্টকস্বরূপ ছিলেন, এজন্য সাহজাহান তাঁহাকে বধ করিয়া থাকিবেন। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু সাহজাহান এপর্য্যন্ত কোন অধর্ম্ম কর্ম্ম করেন নাই, এজন্য সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

যাহাহউক সাহজাহান তৎকালে নুরজাহানের স্নেহে একবারেই বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ, নুরজাহানের পূর্ব্ব স্বামির ঔরসজাত একটী কন্যা ছিল, রাজার

চতুর্থ পুত্র সাহরিয়ারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সুতরাং সাহরিয়ারের প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহ জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ সাহজাহান বীর্য্যবান্ ও সক্ষম পুরুষ, তিনি রাজা হইলে তাঁহার আধিপত্য থাকিবে না, এই জন্য তিনি মনে২ স্থির করিয়াছিলেন সাহরিয়ারকে রাজা করিবেন, সাহজাহানকে রাজা হইতে দিবেন না। নুরজাহানকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে ক্ষান্ত করায় তৎকালে এমত কোন লোক ছিল না। তাঁহার পিতা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিতে পারিতেন না, করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নুরজাহানের সহোদর রাজমন্ত্রী হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কোন কথা বলিতে পারিতেন না, এই জন্য তিনি আরো প্রবলা হইয়াছিলেন।

নুরজাহানের মনোভিলাষ এই ছিল, সাহজাহান পিতার নিকটে থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে জাহাঙ্গীরের অবর্ত্তমানে সাহরিয়ারের রাজ্য প্রাপ্তির কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। দৈবযোগে ঐ সময়ে ইরানাধিপতি কান্ধার রাজ্য অধিকার করিলেন। তাহাতে রাজরাণী এই প্রস্তাব করিলেন সাহজাহান অতি বীর পুরুষ, তদ্ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি দ্বারা এই রাজ্য পুনরুদ্ধৃত হওয়া সম্ভব নহে, অতএব তিনি ঐ যুদ্ধে গমন করুন। সাহজাহান বিমাতার মনোগত অভিপ্রায় না বুঝিয়া তখন

সংগ্রামসজ্জা করিয়া যাত্রা করিলেন। পরে তাঁহার মন্ত্রণা বুঝিয়া মাণ্ডু হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন, ভবিষ্যতে আমার রাজ্যপ্রাপ্তির বিঘ্ন না ঘটে, তাহার বোধ পাইলে আমি এই যুদ্ধে গমন করিতে পারি, নতুবা পারি না। নুরজাহান আজ্ঞা দিলেন যদি তুমি যুদ্ধে গমনে অসম্মত হও তবে সাহরিয়ার সেনাপতি হইয়া যাইবেন, তুমি সৈন্যগণকে রাজধানী পাঠাইবে। কিন্তু এই আজ্ঞা দিয়া সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, মনে২ ভয় হইল যদি সাহজাহান বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহা হইলে অনর্থোৎপত্তি হইবে। অতএব মহাবীর মহব্বত খাঁকে কাবুল হইতে আনাইলেন, যেহেতু তত্তুল্য বিচক্ষণ সেনাপতি তৎকালে আর ছিল না।

এই গোলযোগের সময়ে জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে বাস করিতেছিলেন। যখন বড় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, তখন

হিং ১০৩১
খৃ ১৬২২

কাশ্মীর হইতে আসিয়া লাহোরে অবস্থিতি করিলেন। তথা হইতে পুত্রের সঙ্গে পত্রাদি লেখালেখি হইতে লাগিল, কিন্তু পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ঘুচিল না। অধিকন্তু সাহজাহানের কুমন্ত্রণাকে লিপ্ত বোধ করিয়া, জাহাঙ্গীর তাঁহার কয়েক জন লোককে বধ করিলেন। সাহজাহান দেখিলেন পিতা তাঁহার প্রতি নিতান্ত বক্র। অতএব আগ্রা অধিকার করিবার মানসে যাত্রা করিয়া, দিল্লীর বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণে বিলাসপুর পর্যন্ত গমন করিলেন। জাহাঙ্গীর তাহা দেখিয়া লাহোর

হইতে তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিতে লাগিলেন। সাহজাহান নিরাশ হইয়া বিলাসপুর হইতে মিবার পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় রাজসেনাদিগের সহিত তাঁহার সৈন্যের একটা যুদ্ধ হইল। সাহজাহান পরাস্ত হইয়া মালব প্রদেশে পলায়ন করিলেন। জাহাঙ্গীর আজমীর পর্য্যন্ত স্বয়ং তাঁহার পশ্চাৎ২ গেলেন। পরে রাজপুত্র পরবেজ ও মহব্বত খাঁকে তাঁহাকে ধরিবার জন্য পাঠাইলেন। ঐ সময়ে সাহজাহানের অনেক সেনা পলাইতে লাগিল।

খ্রিং ১৬০০ }
খৃ ১৬২৪ }

তাহাতে তিনি নর্ম্মদা পার হইয়া তৈলঙ্গে, তথা হইতে মসলিপাটনে গমন করিলেন, তৎপরে বঙ্গদেশে আসিয়া বাঙ্গলা ও বেহার অধিকার করিলেন। এবং আলাহাবাদের দুর্গ অধিকার জন্য উদয়পুরের রাজার ভ্রাতা ভীমসিংহকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। রাজপুত্র পরবেজ ও মহব্বত খাঁ দক্ষিণ রাজ্যে যাইয়া যখন শুনিলেন, সাহজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া আলাহাবাদ লইতে গিয়াছেন, তখন তাঁহারা ঐ স্থান রক্ষার্থ দ্রুতগমন করিলেন। সাহজাহান তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ গঙ্গাপার হইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঐ দেশস্থ লোকেরা তাঁহাকে নৌকা বা খাদ্য দ্রব্যাদি কিছুই দিল না, এবং বঙ্গদেশ হইতে তিনি যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারাও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। সাহজাহান বিধিমতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, সুতরাং পুনর্ব্বার দক্ষিণ

রাজ্যে পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। অতএব তিনি ঐ রাজ্যে যাইয়া মলকাম্বরের সহিত মিলিয়া বরহানপুর আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন। রাজপুত্র পরবেজ ও মহব্বত খাঁ তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার পশ্চাৎ২ ঐ দেশে গমন করিলেন। অনন্তর যখন তাঁহারা নর্ম্মদা পার হইলেন, তখন সাহজাহানের সেনাগণের হৃৎকম্প জন্মিল, তাহারা পালে২ পলায়ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সাহজাহানের মনে অত্যন্ত শঙ্কা জন্মিল। তিনি বিনতি পূর্ব্বক পিতাকে পত্র লিখিলেন, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

কিন্তু এবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধার্য্য না হইতে২ জাহাঙ্গীর আপনি ঘোর বিপদে পড়িলেন, তাহার বিবরণ এই—সাহজাহান দক্ষিণ রাজ্যে পলায়ন করিলে জাহাঙ্গীর বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য দুই বার কাশ্মীরে গমন করেন। তৃতীয় বৎসরে কাবুলের রসনিয়া জাতীয়েরা উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহাতে তিনি সে বৎসর কাশ্মীরে না যাইয়া কাবুলে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মহব্বত খাঁ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষ, রাজমন্ত্রির সহিত তাঁহার চিরশত্রুতা ছিল, কি জানি রাজার অনুপস্থিতিকালে তৎকর্ত্তৃক রাজ্যের কোন অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় রাজরাণী তাহাকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষাধীন রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা দিলেন, তুমি বঙ্গদেশে

অনেক অর্থ অপচয় করিয়াছ, অতএব রাজসভাতে আসিয়া তাহার নিকাশ দিবে। মহব্বত খাঁ প্রথম নানাপ্রকার আপত্তি করিলেন, রাজ্ঞী তাহা শুনিলেন না। মহব্বত কি করেন রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পঞ্চ সহস্র বিশ্বস্ত রজঃপুত সেনা সমভিব্যাহারে সিন্ধুতটে রাজার কটকে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, ইহাতে মহব্বত অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন।

মহব্বত খাঁ ইতিপূর্ব্বে বরখোরদার নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বিবাহে রাজানুমতি লয়েন নাই, এজন্য রাজা পাত্রকে বিবসন করিয়া প্রহার করান, এবং যৌতুকের তাবৎ ধন কাড়িয়া লয়েন। ইহাতেও মহব্বত অপমানিত হইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার মনে২ আক্রোশ ছিল। অধুনা সেই আক্রোশ আরও বৃদ্ধি হইল। অতএব সময় পাইলে ইহার প্রতিকার করিবেন এই প্রতিজ্ঞায় থাকিলেন।

জাহাঙ্গীর ঐ সময়ে সিন্ধুর বাম তটে শিবির করিয়াছিলেন। পরে কাবুল গমনার্থ নৌকার সেতু প্রস্তুত করাইয়া প্রথমে সেনা সকলকে পার হইতে আজ্ঞা দিলেন। সেনাগণ দিবসে পার হইয়া দক্ষিণ পারে থাকিল। জাহাঙ্গীর প্রত্যুষে পরপারে যাইবেন এই প্রকার কল্পনা ছিল। যখন মহব্বত দেখিলেন, সেনাসকল দক্ষিণ পারে গিয়াছে কেবল রাজা ও তাঁহার সেবকেরা বাম তটে আছে,

তখন তাঁহার পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী রজঃপুত সেনার মধ্যে দুই সহস্র সেনাকে আজ্ঞা দিলেন তাহারা সেতু আটক করিয়া থাকে, বামতট হইতে কেহ যাইতে চাহিলে যাইতে দেয়, কিন্তু দক্ষিণ তট হইতে কাহাকেও আসিতে নাদেয়। পরে তিনি স্বয়ং অবশিষ্ট ৩০০০ সেনা লইয়া রাজার শিবির বেষ্টন করিয়া একেবারে তাঁহার তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জাহাঙ্গীর সমস্ত রাত্রি মদ্যপানাদি করিয়া তখন-পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে ছিলেন। সৈন্যের কোলাহলে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া ত্বরিত গাত্রোত্থান করিয়া মহব্বতকে সম্মুখে দেখিয়া অসিধারণ পূর্ব্বক অতি ক্রোধে কহিলেন, অরে কৃতঘ্ন তোর কি এই কর্ম্ম? মহব্বত অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন মহারাজ আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কোন প্রকারে তাহা ঘটে নাই, অতএব মহারাজের চরণ দর্শনের জন্য এই উপায় করিয়াছি। এই কথায় জাহাঙ্গীর ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। মহব্বত বলিলেন মহারাজ এইক্ষণে তাম্বু হইতে বাহিরে আসুন, মহারাজকে দেখিয়া সকলের দুর্ভাবনা দূর হউক। জাহাঙ্গীর বস্ত্রাদি পরিধানচ্ছলে রাজরাণীর তাম্বুতে যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মহব্বত যাইতে দিলেন না। তাহাতে জাহাঙ্গীর সেই খানে বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক তাম্বুর দ্বারে আসিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। মহব্বত বলিলেন গজের পৃষ্ঠে

হি ১০৩৫
খৃ ১৬২৬। মার্চ

সকলে মহারাজকে দেখিতে পাইবেন, অতএব হস্তী আরোহণ করুন, ইহা বলিয়া আপনার মাতঙ্গে আরোহণ করাইলেন। পরে রজঃপূত সেনা বেষ্টন করিয়া আপনার শিবিরে লইয়া গেলেন।

জাহাঙ্গীর এই প্রকার বন্দী হইলে নুরজাহান তাঁহাকে উদ্ধার করিবার কোন উপায় না দেখিয়া, ছদ্মবেশে অতি সামান্য একখান শিবিকা করিয়া দক্ষিণ পারে গমন করিলেন, কেহ আটক করিল না। রাণী তথায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা ও আর২ প্রধানদিগকে নানামতে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, বলিলেন তোমাদিগের চক্ষের সমক্ষে রাজা বন্দী হইলেন, তোমরা ইহা দেখিয়াও তাঁহার উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিলে না, তোমরা অতি নরাধম। এই প্রকার অনেক ভর্ৎসনা করিয়া তিনি সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন। পরদিন প্রভাতে আপনি এক বৃহৎ হস্তী আরোহণ করিয়া সমরবেশে বাহির হইলেন। সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নদীতটে আসিয়া দেখিলেন রজঃপূতেরা সেতু দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব পার হইতে না পারিয়া নদীর কিয়দ্দূরে একটা চড়া দিয়া সসৈন্যে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও আর২ প্রধানেরা পার্শ্বে২ চলিলেন। কিন্তু চড়ার স্থানে২ গভীর জল, মধ্যে২ চোরা বালী, কোন২ স্থানে অত্যন্ত স্রোতঃ; ইহাতে পার হওয়া অতি কঠিন হইল। বিশেষ, সম্মুখে বিপক্ষসেনা

রাণীকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিগ হইতে তীর ও গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। রাণীর দৌহিত্রী তাঁহার ক্রোড়ে ছিল, তাহার রক্ষার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহার শরীরে একটা শর প্রবিষ্ট হইল। তদনন্তর তাঁহার মাহুত আহত হইয়া জলে পড়িল। মাহুত অভাবে হস্তী চালায় এমত লোক রহিল না। বিশেষ, হস্তীর শুণ্ড গুলিতে বিদ্ধ হইল, হস্তী সেই ত্রাসে শুণ্ড উত্তোলন না করিয়া মুণ্ড ডুবাইয়া চলিতে লাগিল। রাজরাণী অতি বিপদগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল। একে পোশাক আঁটা ও হস্তে অস্ত্র, সাঁতার দিতে না পারিয়া অনেকে তরঙ্গে ভাসিয়া গেল, কতক খাবি খাইতে লাগিল, কতক জলমগ্ন হইল। হস্তী, অশ্ব, মনুষ্যে, নদী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যে সকল সৈন্যেরা পার হইল, তাহাদের পোশাক ভিজিয়া মুটিয়ার বোঝা হইল। বারুদে জল লাগিয়া কোন্ পদার্থ রহিলনা। এই দুরবস্থার পরে তটে পদার্পণ মাত্র শত্রুসেনা উপর হইতে শর ও অগ্নি বৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাতে অনেকে হত ও আহত এবং অনেকে নদীতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে লাগিল। রাণী পর পারে উঠিলে তাঁহার বন্দিনীগণ নিকটে উপস্থিত হইল। রাণী প্রথমতঃ দৌহিত্রীর অঙ্গ হইতে শর বহির্গত করিয়া আহত স্থান বন্ধন করিলেন, পরে সৈন্যগণের দুরবস্থা প্রযুক্ত স্বামীর পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া আপনাকে

মহব্বতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মনে করিলেন রাজার যে দশা হইয়াছে আমারও তাহাই হউক, ইহার পর যদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হন তবে তাহার উপায় করা যাইবে।

মহব্বত, রাজা ও রাণীকে হস্তগত করিয়া রাজমন্ত্রী আসফ ও আর যে যে প্রধান লোক পলায়ন করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও ধরিলেন, এমতে সকলেই বন্দী হইলেন। মহব্বত তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া কাবুলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অহোরাত্র জাহাঙ্গীরকে বেষ্টন করিয়া থাকিল। রাজা ও রাণী তিলার্দ্ধ সৈন্যমণ্ডলীর বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু ইহাতেও মহব্বতের মনে একটা দুর্ভাবনা রহিল, তাঁহার নিজ সেনা অপেক্ষা রাজসেনা অধিক, তাহারা বিপক্ষ হইলে রাজাকে আটক করিয়া রাখা কঠিন হইবে। নুরজাহান তখন কোন বিপক্ষতাচরণ না করিয়া চতুরতা পূর্ব্বক জাহাঙ্গীরকে মহব্বতের সহিত সৌহৃদ্য করিতে পরামর্শ দিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার মন্ত্রণাক্রমে তাঁহার সাক্ষাতে মন্ত্রী ও রাণীর নানাপ্রকার গ্লানি করিতে লাগিলেন, একথা পর্য্যন্ত বলিলেন। আসফের চক্র হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া মহোপকার করিয়াছ, কিন্তু রাণী ঐ চক্রের মহাচক্রী, তুমি তাঁহার চক্রে কখন পাদক্ষেপ করিওনা। মহব্বত চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া রাজাকে নিতান্ত সুহৃদ বিবেচনা করিলেন।

এই ভাবে সকলে কাবুলে উপস্থিত হইলেন, তথায় পাঠান দিগের ভয়ে রাজার দেহরক্ষক সেনা বৃদ্ধি করিতে হইল। ঐ সময়ে রাণীর অনুগত যাবতীয় লোক আসিয়া তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। রাজার প্রতি তখন মহব্বতের কিছুমাত্র অবিশ্বাস ছিলনা। তিনি তাঁহাকে যথা তথা যাইতে দিতেন। রাজা মধ্যে মধ্যে গজারোহণে শীকার করিতে যাইতেন, কেবল সেনারা তাঁহার সঙ্গে যাইত। একদিন রাজরক্ষক সেনাদিগের সহিত রজঃপুতদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়া রজঃপুতেরা অনেক রাজসেনা বধ করিল। মহব্বতের নিকট ইহার অভিযোগ হইল, কিন্তু তিনি তাহার বিচার করিলেন না। ইহাতে রাজরক্ষকেরা অপমান বোধ করিয়া রজঃপুতদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অনেককে নষ্ট করিল, কতকগুলা রজঃপুত পর্ব্বতে পলাইল, সেখানে পর্ব্বতবাসী লোকেরা তাহাদিগকে ধরিয়া দাস করিয়া রাখিল। এই অবধি মহব্বতের পরাক্রমের খর্ব্বতা হইতে লাগিল, তিনি আর প্রবলভাবে চলিতে পারিলেন না।

রাণী মনে মনে যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। রাণী স্থানান্তরে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। পরে জাহাঙ্গীরকে দিয়া মহব্বতের স্থানে এই প্রস্তাব করাইলেন, প্রধানেরা অনেকে জায়গীর ভোগ করেন কিন্তু কেহই সৈন্যসাহায্য করেন না। একথা উপস্থিত

হইলে মহব্বত আজ্ঞা করিলেন, রাজরাণী সকল অপেক্ষা অধিক জায়গীর ভোগ করেন, তাঁহার সেনা অগ্রে গণিত হউক, পরে আর২ জায়গীরদারের সৈন্য গণনা করাযাই-বেক। নুরজাহান এই আদেশে অপমান বোধ করিয়া ক্রোধ করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সকলের যাহা কর্ত্তব্য তাঁহা-কেও তাহা করিতে হয় এই বলিয়া তিনি যে সকল লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদিগকে দণ্ডায়মান করাইলেন। জাহাঙ্গীর এই সৈন্য গণনা করিতে গেলেন, মহব্বত তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহা-কে যাইতে নিষেধ করিলেন। মহব্বতের তখন তাদৃশ পরাক্রম ছিল না, সুতরাং রাজার নিষেধ শুনিতে হইল।

জাহাঙ্গীর সৈন্য সন্দর্শনে উপস্থিত হইলে রাণীর সৈন্য-গণ চক্রাকারে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। এবং রাজসমভি-ব্যাহারী রাজপুত অশ্বারোহী সেনাগণকে কাটিয়া লণ্ড ভণ্ড করিল। মহব্বত এই কাণ্ড দেখিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া অবিলম্বে পলাইলেন। রাণী তাঁহার প্রতি অত্যা-চার করিতে পারিতেন, কিন্তু রাজমন্ত্রী আসফ খাঁ তখন পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তে ছিলেন, এজন্য তাহা না করিয়া, তাঁহার সঙ্গে এই শর্ত্ত করিলেন তিনি সাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার হইবে না।

সাহজাহান ঐ সময়ে আজমীরে আসিয়াছিলেন, তাঁ-হার সঙ্গে কেবল এক সহস্র সৈন্য ছিল। তিনি মনে

করিয়াছিলেন ক্রমে আরো সৈন্য সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু কৃষ্ণসিংহ নামে এক রজঃপুত রাজা তাঁহার সহকারী ছিলেন, তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে ঐ সৈন্য অর্দ্ধেক হইয়া পড়িল। সাহজাহান বলহীন হইয়া ভয়ে বালুকারণ্য দিয়া সিন্ধু রাজ্যে পলায়ন করিলেন। তথা হইতে বিমাতার ভয়ে পারসস্থানে যাইবার মনস্থ করিলেন, কেবল শারীরিক অসুস্থতাপ্রযুক্ত যাইতে পারিলেন না। কিয়দ্দিবস পরে শুনিলেন তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর পরবেজ লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এবং মহব্বত রাজার সঙ্গে বিরোধ করিয়া রাজসৈন্যের ভয়ে দক্ষিণ রাজ্যে পলায়ন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার আশা পুনর্ব্বার বলবতী হইল, তিনি মহব্বতের সহিত মিলিলেন।

জাহাঙ্গীর বৎসর বৎসর কাশ্মীরে যাইবার নিয়ম করিয়াছিলেন, লাহোর হইতে প্রত্যাগত হইয়া ঐ নিয়ম রক্ষার্থ তথায় গমন করিলেন। কাশ্মীর যাইয়া তাঁহার কাসরোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, তাহাতে তথায় থাকা পরামর্শ সিদ্ধ হইল না। অতএব তিনি লাহোরে যাত্রা করিলেন।

হিং ১০৩৭ সফর ২৮
খৃ ১৬২৭ অক্টবর ২৮
কং ৪৭২৯ কার্ত্তিক।

কিন্তু অর্দ্ধেক পথ না আসিতে২ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সর টামস রো নামে* ইংল-

---

* জেম্‌স প্রথম।

ণীয় রাজার এক দূত তাঁহার সভাতে আসিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সভাতে বাস করিয়াছিলেন, এবং জাহাঙ্গীরের সঙ্গে একত্র মদ্যপানাদি করিতেন। তিনি রাজসভার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে আমেরিকা হইতে তমাক আনীত হইয়া তাহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ঐ মহাদ্বীপে ইহাকে তবাক বলিয়া থাকে। জাহাঙ্গীর তদ্ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই তমাক এইক্ষণে সকল ব্যবহারীয় দ্রব্যের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তমাক না খায় এমত অত্যাল্প লোক দেখা যায়।

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে পারসী ভাষাতে কর্ম্মকার্য্য চলিত, কিন্তু হিন্দুস্থানী ভাষাতে কথোপকথন হইত।

একবিংশ অধ্যায়

সাহজাহান।

জাহাঙ্গীরের জীবনাবধিই নুরজাহানের আধিপত্য ছিল, তাঁহার জীবনান্তে তাঁহার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নুরজাহান স্বীয় জামাতা সাহরিয়ারকে রাজ্য প্রদান করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পারেন নাই। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে বন্দীবেশে রাখিয়া সাহজাহানকে দক্ষিণ রাজ্য হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সিংহাসন অর্পণ করিলেন।

সাহজাহান রাজ্যেশ্বর হইয়া নুরজাহানের ভরণ পোষণের জন্য বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ মুদ্রা নিয়োজিত করিয়া দিলেন। নুরজাহান ঐ বৃত্তিভোগিনী হইয়া বিংশতি-বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন। ইহার মধ্যে রাজসম্পর্কীয় কোন কথার মধ্যে থাকিতেন না, কেবল পতি-চিন্তায় কাল যাপন করিতেন। কথিত আছে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তিনি রঙ্গিন বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিতেন, মাংসাদি ভক্ষণ করিতেন না। এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব তাঁহার অনুমতি ক্রমে জাহাঙ্গীরের শবের পার্শ্বে নিখাত হইয়াছিল।

সাহজাহান রাজা হইলে পর সাহরিয়ার লাহোরের রাজভাণ্ডার অধিকার করিয়া আপনি রাজপদ গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া আসফ খাঁ লাহোরে গমন করেন। তিনি উপস্থিত হইলে সাহরিয়ার তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু জয়ী হইতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিলেন। কিন্তু ইহাতে নিস্তার পাইলেন না। দুর্গরক্ষকেরা তাঁহাকে মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিল। অতঃপর মন্ত্রী তাঁহাকে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, সাহজাহান তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। দানিয়ালের দুই পুত্র সাহরিয়ারের সঙ্গে মিলিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাদিগেরও প্রাণ দণ্ড হইল।

এই ব্যাপারের পর সাহজাহানের আর কোন শত্রু রহিল না, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন, এবং আসফখাঁ ও মহব্বত খাঁ প্রভৃতি যে সকল বীরবর বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিধিমতে সম্মান ও পদ বৃদ্ধি করিলেন। তদনন্তর ভোজ মহোৎসব ও অট্টালিকা নির্ম্মাণে অপরিসীম ধন ব্যয় করিতে লাগিলেন। রাজ্যাভিষেকের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাতে কাশ্মীর নগরে যে প্রকার ঘটা হইয়াছিল তদ্রূপ ঘটা আর কখন কোন সভাতে হয় নাই। কথিত আছে ঐ সভার জন্য এক তাম্বু প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা তুলিয়া খাটাইতে দুইমাস লাগে। তাম্বুর ভিতর কত সাল মখমল ও কিঙ্খাপে মণ্ডিত

ও তাহা স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরে কিপ্রকার সুশোভিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনে বর্ণ পরিহার মানে। পূর্ব্বে রাজাভিষেক দিবসে রাজাদিগের তুলা হইবার প্রথা ছিল। ঐ তুলাতে কেবল রজত কাঞ্চন ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রদত্ত হইত, তাহা দীন দুঃখী ও অপরাপর মনুষ্যদিগকে দান করা যাইত। সাহজাহানের সময়ে তুলা ভিন্ন মণি মুক্তা ও আর২ মূল্যবান দ্রব্যাদি স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া তাঁহার মস্তক প্রদক্ষিণ করণানন্তর ভৃত্যেরা সারী সারী রাখিয়া দিত। সাহজাহান ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্য উপস্থিত লোকদিগকে বিতরণ করিতেন। ইহা ব্যতীত হয়, হস্তী, অর্থ, মণি মুক্তা ও উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ কত বিতরণ হইত তাহার সংখ্যা নাই। একজন মুসলমান ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন কাশ্মীরে প্রথমবার যে সাম্বৎসরিক রাজাভিষেক হয় তাহাতে অম্লান ষোল ক্রোর মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

সাহজাহানের রাজত্বকালে দক্ষিণ রাজ্যে প্রথম সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। খাঁজাহান নামে লোদিগোষ্ঠীয় এক পাঠান দিল্লীর সম্রাটের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ উচ্চপদস্থ হইয়া অবশেষে দক্ষিণ রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার কেমন কুবুদ্ধি হইল, দিল্লীর রাজার জয়কৃত তাবৎ প্রদেশ আহম্মদ নগরের রাজাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত প্রণয় করিলেন, মনে করিলেন ইহাতে তাঁহার আশার সুসার

হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার সাহজাহানের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া রাজধানীতে আসিলেন। ঐসময়ে একটা জনরব উঠিল, রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবেন। এই কথা তদন্ত না করিয়া তিনি আপনার দুই সহস্র পাঠান সৈন্য লইয়া একেবারে আগ্রা-হইতে প্রস্থান করিলেন। সাহজাহান তাহাকে রাজদ্রোহী বিবেচনা করিয়া স্বসৈন্য তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উহাতে খাঁজাহান প্রথমতঃ গন্দোআনাতে, তাহার পর আহম্মদ নগরে পলায়ন করিলেন। আহম্মদ নগরের রাজা তাঁহার সাহায্যার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন। সাহজাহান স্বয়ং ঐ যুদ্ধে না যাইয়া একজন সেনাপতি পাঠাইলেন। সেনাপতি আহম্মদ নগরের রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে খাঁজাহান দক্ষিণ রাজ্য হইতে বুন্দলখণ্ডে পলায়ন করিলেন। ঐস্থানে রাজসেনাগণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত এবং তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ছিন্ন মস্তক রাজার সমীপে আনিল।

কিন্তু খাঁজাহানের মৃত্যু হইলেও দক্ষিণ রাজ্য উপদ্রব-শূন্য হইল না। ঐপ্রদেশে ক্রমশঃ দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হইল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র লোক গৃহ দ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। পথে আহারাভাবে এক প্রাণীও বাঁচিল না। তাহাদের [illegible] ক্রিয়া করে এমন লোক মাত্র রহিল না। শব [illegible] বায়ু দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইল, ঐ দুর্গন্ধে নানা পীড়ার

সঞ্চার হইতে লাগিল। যাহারা দুর্ভিক্ষে না মরিল তাহারা পীড়াতে মরিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় তাবৎ রাজ্য মনুষ্যশূন্য হইল। রাজ্য একেবারে উচ্ছিন্ন হইল। তাহার পর আহম্মদ নগর ও বিজয় পুরের রাজাদের সঙ্গে মোগলদিগের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ছল, চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, কত হইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। অতঃপর সাহজাহান স্বয়ং ঐ রাজ্যে গমন করিয়া প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধ করিলেন।

হিং ১০৪৭ } তদনন্তর তিনি গোলকন্দা ও বিজয়পুরের
খৃ ১৬৩৭ } রাজাদিগকে বশীভূত, এবং আহম্মদ নগর

একেবারে ধ্বংস করিলেন।

যখন সাহজাহান দক্ষিণের যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন রাজ্যের আর আর স্থানে কয়েক ঘটনা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এই। পর্ত্তুগি জাতীয়েরা কলিকাতার সান্নিধ্যে হুগলিতে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের সুবাদার ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। বুন্দিনারা কয়েকবার রাজ-বিদ্রোহ করিল। প্রথম বিদ্রোহে নৃসিংহদেবের পুত্র হত হইলেন। পূর্ব্বাঞ্চলে রাজসেনাগণ ক্ষুদ্র তিব্বৎ দেশের বন্দোবস্ত সমাপন করিল। আর কতকগুলিন সেনা শ্রীনগর আক্রমণ করিতে যাইয়া প্রায় তাবতে নিহত হইল। তদ্ভিন্ন কতক সেনা কুচবেহার গমন করিয়াছিল, তাহারা ঐ দেশ অধিকার করিল, কিন্তু তথাকার জল বায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিল।

এই সকল ঘটনার পর সাহজাহান ১৬ বৎসর কাবুলে ও ঐ অঞ্চলীয় যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিলেন। ১০৪৭ অব্দে আলিমর্দ্দন খাঁ নামে পারসস্থানের রাজার পক্ষ যে ব্যক্তি কান্ধারের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি আপন রাজার দৌরাত্ম্যে সাহজাহানকে ঐ রাজ্য সমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। আলীমর্দ্দন অতিশয় বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বান ছিলেন। গৃহাদি নির্ম্মাণে তিনি বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান তাহা অতি অপূর্ব্ব। সর্ব্বাপেক্ষা দিল্লীর খাল অতি উত্তম। ঐ খাল অদ্যাপি তাঁহার নামে খ্যাত আছে, এবং ইহাতে তাঁহার গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই গুণের জন্য সাহজাহান তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এবং একবার তাঁহাকে কাশ্মীরে ও আর একবার কাবুলের কর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাকে অনেক যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শান্তিসময়েও তাঁহাকে অনেক উত্তম ২ কর্ম্ম দিয়াছিলেন।

কান্ধার রাজ্য আয়ত্ত হইলে বক্ত্রিয়া রাজ্য অধিকারের সদুপায় হইল। অতএব সাহজাহান আলীমর্দ্দনকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া উজবকদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। আলিমর্দ্দন হিন্দুকুশ পার হইয়া বক্ত্রিয়াতে গমন করিলেন। কিন্তু শীত সমাগমে, অত্যন্ত শীতের আশঙ্কায়, ফিরিয়া আসিলেন। পর বৎসর জগৎসিংহ নামে এক রজঃপুত রাজা

হি° ১০৫৪
খৃ ১৬৪৪

১৪০০০ রজঃপুত সেনা লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। রজঃপুত সেনাগণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিয়া বড় হিম সহ্য করিতে পারিত না, তথাপি শীত শঙ্কা না করিয়া শীত নিবারণের জন্য বড় ২ বাহাদুরী কাষ্ঠ ফাড়িয়া কাষ্ঠময় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিল। রাজাও স্বহস্তে তাহাদের সঙ্গে কাষ্ঠ ফাড়িতে লাগিলেন। এই প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া উজবকদিগকে পুনঃপুনঃ পরাস্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও জয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। পরবৎসর সাহজাহান স্বয়ং কাবুলে গমন করিয়া তথা হইতে স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে আলীমর্দ্দনের সমভিব্যাহারে বল্কিয়াতে পাঠাইলেন। আলীমর্দ্দন এযাত্রায় সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হইলেন। কিন্তু পরবৎসর রাজা দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলে, মুরাদ তাঁহার পশ্চাৎপশ্চাৎ দিল্লীতে আসিলেন। মুরাদের গমনের পর উজবকেরা অলকনন্দা পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ উৎখাত করিল। মুরাদ বিনা আজ্ঞাতে চলিয়া আসিলেন তাহাতে এই ফল হইল, এই বিবেচনায় সাহজাহান তাঁহার অসম্মান করিয়া, তৃতীয় পুত্র আওরংজেবকে ঐ যুদ্ধের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলেন। আপনিও তাঁহার সঙ্গে ২ কাবুল পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আওরংজেব যুদ্ধ জয় করিলেন, কিন্তু তাহার পর উজবকেরা তাঁহাকে এমত ভাবে অবরুদ্ধ করিল, তিনি দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিলেন, বাহির হইতে পারিলেন না। সাহজাহান দেখিলেন এত অধিক দূরে ঐ রাজ্য জয়

করিয়া কোন ফল হইল না, তাহা রক্ষা করা কঠিন। অতএব উজবকজাতীয় এক রাজপুত্র বক্ত্রিয়া হইতে পলাইয়া তাঁহার সভাতে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাকে ঐ রাজ্য অর্পণ করিলেন। তাহাতে আওরংজেব্ স্বদেশে প্রত্যা-

খৃ. ১৬৫৮ } গমন করিলেন। সাহজাহান বক্ত্রিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে, ১০৫৮ অব্দে, পারসস্থানের রাজা কান্ধার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সাহজাহান ঐ রাজ্য রক্ষার্থে আওরংজেবকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যে সময় পারসস্থানের রাজা ঐ দেশ আক্রমণ করিলেন তখন অত্যন্ত শীত। তৎকালে এইদেশ হইতে উত্তরাঞ্চলে লোকের গমনাগমন এক প্রকার রুদ্ধ হইত। শীতপ্রযুক্ত আওরংজেব্ শীঘ্র পৌঁছিতে পারিলেন না, সুতরাং পারসরাজ ঐ রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। তদনন্তর আওরংজেব্ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পর বৎসরেও তিনি পুনর্ব্বার তথায় গমন করিলেন, তাহাও বিফল হইল। অনন্তর সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সেকো ঐ যুদ্ধ জয় করিব বলিয়া আস্ফালন করিলেন। তাহাতে রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক তথায় পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার গমনই সার হইল, পারসী সেনারা তাঁহাকে ঐ স্থান স্পর্শ করিতে দিল না। দারা নিরাশ ও হতমান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তদবধি কান্ধার রাজ্য মোগলদিগের একেবারে হস্ত ছাড়া হইল।

ইহার পর দুই বৎসর কোন যুদ্ধাদি হয় নাই। ঐ সময়ে দক্ষিণ রাজ্যের জরীপ কর্ম্ম সমাপন হইল। এই জরীপ ২০ বৎসর অবধি হইতেছিল, এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। জরীপ সমাপন হইলে সাহজাহান তোডরমল্লের ধারাক্রমে কর ধার্য্য করাইলেন, তাহাতে রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হইল, এবং কর সংগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় কোন গোলযোগ রহিল না।

হিং ১০৬০
খৃ ১৬৫০

এই সময়ে সাদুল্লা নামে রাজমন্ত্রীর মৃত্যু হইল। সাদুল্লা অতি বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন, তত্তুল্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ও রাজহিতৈষী মন্ত্রী ভারতবর্ষে আর কখন দেখা যায় নাই।

অনন্তর আওরংজেবের যশোলাভের আর এক উপায় হইল। মিরজুমল নামে এক রত্নবণিক গোলকন্দার রাজার মন্ত্রী ছিলেন। রাজার সহিত তাঁহার মনোবিচ্ছেদ হওয়াতে তিনি সাহজাহানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আওরংজেব এই বিষয়ে পিতাকে অনুরোধ জানাইলেন। সাহজাহান সেই অনুরোধে গোলকন্দার রাজার উপর ধুমধাম করিয়া পত্র লিখিলেন। গোলকন্দার রাজা তাহা না শুনিয়া তাঁহার আজ্ঞা অবহেলন করিলেন। এই ক্রোধে আওরংজেব যুদ্ধসজ্জা করিয়া তথায় গমন করিলেন। আওরংজেব ছল পাইলে বলের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না, অতএব অধিকাংশ সেনা পশ্চাৎ রাখিয়া

কতকগুলি সেনা সমভিব্যাহারে আওরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইয়া, এই কথা প্রকাশ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সুজা বঙ্গদেশের সুবাদার, তাঁহার কন্যার সহিত তৎপুত্র মহম্মদের বিবাহ দিতে যাইতেছেন। আওরঙ্গাবাদ হইতে মাসুলিপাঠাম দিয়া বঙ্গদেশের পথ। গোলকন্দার রাজধানী হায়দ্রাবাদ তাহার অধিক দূর নহে।

গোলকন্দার রাজা আওরংজেবের প্রকৃত অভিপ্রায় কিছুই জানিতেন না, রাজপুত্র আসিতেছেন এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সম্মানার্থ মহা ভোজের আয়োজন করিতে লাগিলেন, যুদ্ধ বা আত্মরক্ষার কোন আয়োজন করিলেন না। আওরংজেব ঐ অবকাশে হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করিলেন। গোলকন্দার রাজা যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য এক পর্ব্বতীয় দুর্গে পলায়ন করিলেন। আওরংজেব হায়দ্রাবাদে পড়িয়া ঐ দেশ লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিলেন। অনন্তর যখন তাঁহার পশ্চাতের সৈন্যগণ আসিয়া যুটিল, তখন তাঁহার প্রবল দল হইল। গোলকন্দার রাজা যুদ্ধসজ্জা করিয়াও তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে অক্ষম হইলেন, আওরংজেব যাহা বলিলেন তাহা শিরোধার্য্য করিতে হইল।

এই প্রকারে গোলকন্দা জয় করিলে বিজয়পুর আক্রমণের এক পন্থা হইল। আওরংজেব ঐ রাজ্য অনায়াসে জয় করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার পর স্থানান্তরগমনের প্রয়োজন হইল, তাহাতে ঐ দেশ জয় করিতে পারি-

লেন না। যে প্রয়োজনে, স্থানান্তর গমন করিতে হইল তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

সাহজাহানের চারি পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠ দারা সেকো, দ্বিতীয় সুজা, তৃতীয় আওরংজেব, চতুর্থ মুরাদ। দারার অনেক সদ্গুণ ছিল, তিনি সাহসী সরল এবং সৌজন্য-শীল ছিলেন, দোষের মধ্যে অত্যন্ত প্রচণ্ড স্বভাব, কাহার পরামর্শ শুনিতেন না, আপনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন। তাঁহার বিদ্যাও ভাল ছিল। তিনি আকবরের মতাবলম্বন পূর্ব্বক হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিরোধ ভঞ্জন করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সুজা বিদ্বান্ ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা মদ্য ও ইন্দ্রিয়-সুখের বশীভূত থাকিতেন। আওরংজেব্ সুন্দর, সাহসী, সদা-লাপী ও ধীরবুদ্ধি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত খল, চিত্ত সর্ব্বদা অনির্ম্মল, এবং বুদ্ধি নিতান্ত কুটিল ছিল, তাঁহার মনের ভাব কেহ বুঝিতে পারিত না। তাঁহার মুখে এমন মধুবর্ষণ হইত যে শত্রুপর্য্যন্ত তাহাতে ভুলিয়া যাইত। তিনি মুসলমান-ধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করিতেন সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রম করিবেন। কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা, মনের ভাব তাহা ছিল না। মুরাদ বীর্য্যবান, অথচ উদারচরিত্র ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন।

সাহজাহান সর্ব্বাপেক্ষা দারাকে ভাল বাসিতেন, এবং

বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া রাজকর্ম্মের অনেক-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। দারা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সকল কর্ম্ম করিতেন, এবং পিতার অবর্ত্তমানে রাজা হইবেন ইহাও নির্দ্ধার্য্য হইল। অনন্তর রাজার একটা পীড়া জন্মিয়া হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইল, রক্ষার কোন আশা রহিল না, তিনি শয্যাগত হইয়া থাকিলেন। দারা এই পীড়ার কথা প্রকাশ না করিয়া আপনি রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার পীড়ার কথা অপ্রকাশ রহিল না। সুজা তাহা জানিতে পারিয়া অবি-লম্বে বঙ্গদেশ হইতে সসৈন্যে আগ্রাতে যাত্রা করিলেন। মুরাদ গুজরাটের সুবাদার ছিলেন, তিনিও সম্রাট-পদ গ্রহণ করিয়া আগ্রা গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত আওরংজেব বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ না করিয়া বীর্য্যবান অথচ উদারচরিত্র মুরাদকে আপনার উচ্চ আশার সো-পান করিয়া পত্র লিখিলেন, আমি মক্কা গমন করিব, রাজত্বের আশা করি না, কিন্তু দারা অতি অধার্ম্মিক,* তিনি পিতাকে বন্দিবেশে রাখিয়া আপনি রাজত্ব করি-বার মনস্থ করিয়াছেন। একর্ম্ম অতি গর্হিত, ইহা দেখিয়া আমি কোন প্রকারে নিরস্ত থাকিতে পারি না, অতএব তোমাকে লিখিতেছি যদি তুমি আমার সহায়তা কর তবে

* দারা আকবরের মতাবলম্বী ছিলেন এই জন্য তাঁহাকে অধা-র্ম্মিক বলিতেন।

আমি পিতাকে তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করি। তাহার-পর পিতাকে বুঝাইয়া যাহাতে তিনি দারাকে ক্ষমা করেন তাহার চেষ্টা হইতে পারে। আওরংজেব ঐ পত্রে শপথ করিয়া লিখিলেন তাঁহার বাধ্য হইয়া চলিবেন, কখন তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। মুরাদ আওরংজে-বের প্রতারণা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া আগ্রাতে যাত্রা করিলেন।

ইতিমধ্যে সাহজাহান আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া আপনি রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন, এবং সুজাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন তুমি কেন সংগ্রাম সজ্জা করিয়া আসিতেছ, বঙ্গদেশে প্রতিগমন কর। সুজা বিবেচনা করিলেন এই পত্র দারা লিখিয়া থাকিবেন, পিতা লেখেন নাই। অতএব সেই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। তাঁহার আগমন নিবারণার্থ দারার পুত্র সলীমান রাজ-সেনাধ্যক্ষ হইয়া যাত্রা করিলেন। বারাণসের সান্নিধ্যে সুজার সহিত যুদ্ধ হইল। সুজা এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে আওরংজেব মুরাদের সহিত মিলিয়া আগ্রা-লক্ষ্যে গমন করিতে লাগিলেন। সাহজাহান ঐ সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগের গমন রোধ জন্য রাজা যশবন্ত সিংহকে প্রেরণ করিলেন। রাজা যশবন্তসিংহ উজ্জয়িনী নগরের সান্নিধ্যে তাহাদিগকে আটক করিলেন। আটক করাতে মহা যুদ্ধ হইল। রজঃপুত সেনাগণ অতি সাহসে

যুদ্ধ করিল, কিন্তু আর ২ রাজসেনা তাহাদের পৃষ্ঠপুরক হইল না, তাহাতে যশবন্ত জয়ী হইতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে মুরাদ অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর দুই ভ্রাতা আগ্রাতে যাত্রা করিলেন। ইতি-মধ্যে সাহজাহান আগ্রা হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন, এবং আপনি যুদ্ধে গমন করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রণসজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুত্রদের সহিত সংগ্রাম করা সৎপরামর্শ হইল না। তাহাতে দারা রণসজ্জা করিয়া আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। সাহজাহান তাঁহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন, তিনি তাহা শুনিলেন না। তৎপুত্র সলীমান বারাণস হইতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র হইয়া যাইবেন তাহারও অপেক্ষা করিলেন না। আগ্রা হইতে একদিবসের পথ গমন করিলে ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দুই সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দারা বিপর্য্যয় সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী রজঃপুত ও উজবক সৈ-ন্যেরাও নানা প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। মুরাদ হস্তী আরোহণে ঐ সকল সেনার সম্মুখে গমন করিলেন। তাঁহার হস্তী শত্রুশরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। মুরাদ লৌহশৃঙ্খলে তাহার পদ বন্ধন করিয়া রাখিলেন। হস্তী পলাইতে পারিল না, মুরাদ গজপৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপর চারিদিগ

হইতে শরবর্ষণ হইতে লাগিল, তাঁহার হাওদাখানি* শরে শরে সজারু পক্ষির শরীরের ন্যায় হইল। আওরংজেব স্বভাবতঃ বীর্য্যবান্; অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্যগণকে নানাপ্রকার উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। সেনাগণ অতি সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রকার ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কোন পক্ষে জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। অনন্তর দারা যে মাতঙ্গ আরোহণ করিয়াছিলেন তাহার গাত্রে একটা বোমা প্রবেশ করিল। বোমাঘাতে হস্তী অস্থির হইল। দারা তাহা দেখিয়া এক তুরঙ্গ আরোহণ করিলেন। তাঁহার সেনাগণ তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে না দেখিয়া অনুমান করিল তিনি হত হইয়া থাকিবেন। ইহাতে সর্ব্ব সেনার মহা আতঙ্ক হইল, সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দারা পরাজিত হইয়া লজ্জায় পিতার নিকটে না যাইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন।

এবম্প্রকারে সংগ্রাম জয় হইলে আওরংজেব নতজানু হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে মুরাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। তদনন্তর উভয়ে আগ্রার সম্মুখে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে কেহ প্রতিবন্ধকতা করিল না। অনন্তর উভয়ে পিতার স্থানে নানা-

* অতি আশ্চর্য্য বিবেচনা করিয়া এই হাওদা খানি অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়াছিল।

প্রকার অনুনয় বিনয় জানাইয়া আপনাদের দোষ পরিহারের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সাহজাহান তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, তিনি জানাইলেন তাহাদিগের মুখাবলোকন করিবেন না, দারাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবেন। আওরংজেব দেখিলেন, পিতাকে হস্তগত না করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। অতএব তৎপুত্র মহম্মদকে আজ্ঞা দিলেন সাহজাহানের দুর্গ অবরোধ করেন, এবং তন্মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেন। মহম্মদ তাহাই করিলেন। সাহজাহান দুর্গের মধ্যে বন্দিবেশে থাকিলেন।

আওরংজেবের মনে মনে যে অভিলাষ ছিল তাহা পূর্ণ হইল। মুরাদই ইহার মূলাধার, তিনি সাহায্য না করিলে ঐ আশাপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু যখন কর্ম্মসাধন হইল তখন তাঁহাকে আপনার আশাপথের কন্টক জ্ঞান করিয়া, দুই সহোদরে দারার পশ্চাৎ গমন করিতে২ এক দিবস রাত্রে তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। মুরাদ ভোজন করিতে আসিলে আওরংজেব তাঁহাকে অত্যন্ত মদ্যপান করাইলেন। আপনিও তাঁহার সঙ্গে পান করিতে লাগিলেন। মুরাদ মদ্যপানে অজ্ঞান হইলে আওরংজেব তাঁহাকে নিরস্ত্র ও শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া একটা হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিল্লীনগরে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর আর তিনটা হস্তী সেই ভাবে আর তিন দিগে পাঠাইলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ তাঁহার

উদ্দেশ পাইল না। অনন্তর আওরংজেব তাঁহাকে গোয়ালিয়রে* বন্দীবেশে রাখিয়া, আপনি দিল্লীনগরে রাজ্য

হিং ১০৬৮
খৃ ১৬৫৮ আগষ্ট ২০
সং ৫৭৩০ ভাদ্র।

গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখন আপন নামে মুদ্রাঙ্কন করাইলেন না। তৎপরে সাম্বৎসরিক রাজাভিষেকের দিবসে রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া প্রকৃতরূপে রাজ্যারম্ভ করিলেন।

সাহজাহান রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া বন্দীবেশে থাকিলেন। তিনি এই অবস্থায় সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহার পর, ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ৬৭ বৎসর বয়সে রাজ্যচ্যুত হয়েন।

সাহজাহানের সময়ে ভারতবর্ষের যে প্রকার লক্ষীর শ্রী ছিল, আর কোন রাজার রাজত্বকালে সেরূপ হয় নাই। সাহজাহান অন্যান্য অনেক২ রাজার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজরাজ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না। তিনি আপনি বিলাসপ্রিয় ছিলেন, শারীরিক সুখের জন্য সতত কাশ্মীরে বাস করিতেন, তদ্ভিন্ন শোভন অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে ও নগরের শোভাবর্দ্ধনে নিয়ত মনোযোগী থাকিতেন। কিন্তু এই সকল করিয়াও প্রজার সুখসচ্ছন্দতা বিষয়ে কখন অবহেলা করেন নাই। প্রজা

* অতঃপর গোয়ালিয়র রাজ্য কারাগারের ন্যায় হইয়াছিল। যাহারা রাজার অপ্রিয় হইতেন বা রাজবিদ্রোহী হইতেন তাহাদিগকে এই স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা যাইত।

কিপ্রকারে সুখে থাকিবে নিয়ত এই চিন্তা করিতেন। বিচার কর্ম্মে বিজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্য নিযুক্ত করিয়া বিচারের প্রণালী এমত উত্তম করিয়াছিলেন, যে তদ্রূপ বিচার ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর কখন ঘটে নাই। অধিকন্তু প্রজার হিতকর অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন। খাফি খাঁ নামে এক মুসলমান-ইতিহাসলেখক লিখিয়াছিলেন, আকবর অনেক দেশ জয়, এবং অনেক সুন্দর২ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সাহজাহান যে প্রকারে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ, রাজস্ব সংগ্রহ, ও বিচারকর্ম্মের সুনিয়ম করেন, অন্য কোন রাজা তদ্রূপ করিতে পারেন নাই।

অন্য রাজাদের রাজশাসনের সহ তুলনা করিয়া যদিও সাহজাহানের রাজশাসন উত্তম বলা যায়, কিন্তু একনায়ক রাজতন্ত্রে যে সকল দোষ সম্ভব তাহা সাহজাহানের রাজত্বকালে না ছিল এমত বলা যায় না। তিনি যে সকল কর-সংগ্রহকারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা অবশ্যই কখন না কখন অন্যায় কর লইত। বিচার কর্ম্মে যেসকল লোক নিয়োজিত ছিল তাহারা কেহ না কেহ অবশ্যই উৎকোচ গ্রহণ করিত। যাহারা শুল্ক সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল তাহারাও সাধুদিগকে নির্য্যাতন করিত। কিন্তু এ সকল বিবেচনা করিয়াও ইহা স্বীকার করিতে হইবে সাহজাহানের রাজত্বকালে দেশ যেমন লক্ষ্মীবন্ত ও প্রজারা যেমন সচ্ছন্দে ছিল অন্য কোন রাজার সময়ে সেরূপ ছিল না।

তাবুনর নামে এক সাহেব এতদ্দেশে বারম্বার আসিয়া

ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন প্রজার প্রতি রাজার যেপ্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য, সাহজাহানের সে প্রকার ব্যবহার ছিল না। তিনি সকল প্রজাকে সন্তানের ন্যায় দেখিতেন, কাহার প্রতি কাহাকে অন্যায় করিতে দিতেন না, প্রজারা তাঁহার রাজ্যে নির্ভয়ে ও আনন্দে থাকিতেন।

যখন দিল্লীনগরে রাজধানী, তখন রাজা প্রজা সকলের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি ছিল, ইহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ সময়ে পারস রাজ্য অতি প্রতাপশালী, তত্তুল্য ভারি রাজ্য আর ছিল না। কিন্তু মন্দিসোল নামে এক সাহেব লিখিয়াছেন পারসস্থানের রাজধানী ইস্পাহান অপেক্ষা আগ্রানগর অনেক বড় ছিল, এবং তাঁহার পথ, ঘাট, পণ্যালয় পথিকপান্থ অতি সুন্দর২ ছিল। এই সকল লক্ষ্মীর চিহ্ন তাহার সন্দেহ কি। ধন ও মনুষ্যের মনে সুখ না থাকিলে নগরের শোভা বর্দ্ধনে কাহার যত্ন হয় না। কিন্তু কেবল রাজধানীতেই উত্তম উত্তম অট্টালিকাদি ছিল অন্য অন্য স্থানে ছিল না এমত নহে, সর্ব্বত্র নগরে ও রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে অনেক অনেক অট্টালিকাদি ছিল, তাহা অতি রম্য ও উত্তম। অন্য দেশ হইতে যে সকল লোকেরা এদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তাহারা মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

যাহারা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করিতেছেন তাঁহারা এমত অনুমান করিতে পারেন পূর্ব্ব লেখ-

কেরা ইহার অত্যধিক প্রশংসা করিয়াছেন। এমত অনুমান অমূলক। অনেক অনেক প্রাচীননগর এইক্ষণে লোকশূন্য হইয়াছে, অনেক২ রাজালয় কালবশে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, অনেক অনেক প্রণালী অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অনেক অনেক জঙ্গলের মধ্যে রম্য২ হর্ম্ম্য সরোবর ও পাষাণময় ঘাট দেখা যাইতেছে। ইহাভিন্ন কত কূপ পথিকপান্থ ও রাজপথ ভগ্নাবস্থায় দেখা যায় তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। এইসকল দেখিয়া অবশ্য বোধ করিতে হইবে পূর্ব্বে এই দেশে লক্ষ্মী বিরাজমানা ছিলেন, লোক সকল অতি ধনবান ছিলেন, রাজা প্রজার কষ্ট ছিল না।

তবে একথা স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের তাবৎ স্থান সমান ছিল না। অনেক স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, এবং পর্ব্বতাঞ্চলে অসভ্য লোক বাস করিত, তাহারা লুঠপাঠ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বুন্দলখণ্ড প্রভৃতি যে স্থানে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া লোক বাস করিয়াছিল তথাকার অধীন রাজারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইতেন। সাহজাহানের রাজত্বকালেও এবম্ভূত বিদ্রোহাদি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও কদাচিৎ। আর আর প্রদেশে ঐ প্রকার বিদ্রোহাদির কথা প্রায় শুনা যায় নাই।

ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমান রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা সাহজাহানের ধুমধাম ও জাঁকজমক অধিক ছিল। তিনি পূর্ব্ব ২ রাজাদিগের অপেক্ষা রেশালা,

লোক লস্কর, সভার শোভা, অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কর বৃদ্ধি করেন নাই, তথাপি খরচপত্রের টানাটানি ছিল না। অতি অপরিমিত ব্যয়ের মধ্যে তিনি একখান সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, তাহা ময়ূরাকৃতি। ময়ূর, পুচ্ছ বিস্তার করিয়া থাকিলে যেমন দেখায় সিংহাসন খানি প্রকৃত সেই প্রকার হইয়া ছিল, এবং যেখানে যে প্রকার রঙ সেই খানে সেই রঙের রত্নাদি মণ্ডিত হইয়া ছিল, ঐ সকল রত্ন ও মণির প্রখর জ্যোতিতে চক্ষের মণি প্রথরিত হইত। তাবর্ণর নামে যে রত্নপরীক্ষক সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন ঐ সিংহাসনে যে রত্ন ও মণি খচিত হইয়াছিল, তাহার মূল্য অনুমান সাত কোটী মুদ্রা হইবে।

গৃহাদি নির্ম্মাণেও সাহজাহানের অতিশয় অনুরাগ ছিল, এবং তাহাতে অধিক ব্যয় ভূষণ হইয়াছিল। দিল্লী-তে তিনি এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার গঠন ও শোভা পূর্ব্ব নগর অপেক্ষা অনেক মনোহর। এক প্রান্তরের মধ্য স্থলে যমুনার উপরে প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ঐ প্রাসাদে আসিবার তিনটী অতি প্রশস্ত পথ ছিল। এক পথের মধ্য দিয়া একখাল বাহির হইয়াছিল, তাহার দুইধার বৃক্ষ ও উত্তম উত্তম গৃহে সুশোভিত, গৃহের নিম্ন ভাগে পণ্যালয়। রাজবাটীর মধ্যে বড় বড় যে সকল সভাস্থান

সংগর্ম্মরের দালান ও স্বর্ণময় গুম্বেজ করিয়াছিল তাহার শোভা ও পারিপাট্যের কথা কি লিখিব, যে সকল লোকেরা তাহা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা তাহার প্রশংসার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দিল্লী নগরে এক মসজীদ আছে তাহা অতি অপূর্ব্ব, সেপ্রকার মসজীদ আর কোথাও দেখা যায় না। ঐ মসজীদের শিল্পকর্ম্ম যেমন মনোহর তাহার সৌন্দর্য্যও তত্তুল্য। যে ব্যক্তি ঐ মসজীদ নির্ম্মাণ করেন তাহার বুদ্ধিকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিতে হয়।

কিন্তু সাহজাহান যে সকল অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করান তন্মধ্যে আগ্রাতে তাজমহলই প্রধান, তাহার সহিত আর কোন গৃহের তুলনা করা যাইতে পারে না। মমতাজমহাল নামে সাহজাহানের এক মহিষী ছিলেন, তিনি লোকান্তর গমন করিলে সাহজাহান তাঁহার স্মরণার্থ মমতাজমহাল নামে এই অপূর্ব্ব সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মমতাজমহাল নামের অপভ্রংশে এক্ষণে তাহাকে তাজমহল বলা যায়। এই সমাধিস্থান শ্বেত উজ্জ্বল প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহাতে বিবিধ বর্ণের মূল্যবান রত্ন বসান গিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য ও শিল্প নৈপুণ্য দেখিলে অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইয়া যায়। এমন সুশোভিত ও মূল্যবান অট্টালিকা আসিয়া বা ইউরোপ খণ্ডে এপর্য্যন্ত আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই তাজমহল নির্ম্মাণে কত ব্যয় হইয়াছিল তাহা কেহ সংখ্যা

করিয়া বলিতে পারেন না। এই সকল ব্যয়বাহুল্য-কর্ম্মে সাহজাহান অনেক ধন ব্যয় করিয়াছিলেন। বিশেষ, কান্ধারের যুদ্ধযাত্রাতে ও বল্খিয়ার সংগ্রামে অসঙ্খ্যা অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নিয়ত দুই লক্ষ অশ্বারোহী সেনা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। এবং আর আর অনেক ব্যয় ছিল। এই সকল নির্ব্বাহ করিয়া সাহজাহানের রাজ্য অবসান কালে নগদ ২৪০০০০০০০ টাকা রাজভাণ্ডারে স্থিত ছিল। এতদ্ভিন্ন সোণা রূপা রত্ন ও আর আর বহুমূল্য দ্রব্যাদি কত ছিল তাহার সঙ্খ্যা নাই। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে তিনি অতি বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থ ব্যয় করিতেন। বহুব্যয়ী হইয়াও কিছুমাত্র অপব্যয় করিতেন না। অতি সচ্ছলরূপে খরচপত্র করিয়াও তিনি এত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ করিতে হয়।

যৌবনাবস্থাতে সাহজাহানের চরিত্র তাদৃক প্রশংসনীয় ছিল না, কিন্তু রাজত্বের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ দেখা যায় নাই। তিনি প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। প্রজাদিগের দুঃখের কথা শুনিলে সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রে তাহার প্রতিকার করিতেন, এমত প্রজাবৎসল রাজা আর দেখা যায় নাই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আওরংজেব।

আওরংজেব সিংহাসনারূঢ় হইয়া আলমগীর অর্থাৎ জগজ্জয়ী নাম ধারণ করিলেন। তৎপরে তিনি দারাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দারা দিল্লীতে প্রস্থান করিয়া ছিলেন, আওরংজেবের আগমনে তথা হইতে লাহোরে পলায়ন করিলেন। সলীমান তাঁহার সাহায্যে গমন করিতে ছিলেন। আওরংজেবের কৌশলে তাঁহার সেনাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাহাতে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া শ্রীনগরের রাজার শরণ লইলেন। শ্রীনগরের রাজা তাঁহাকে আশ্রয় না দিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর আওরংজেব দারার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে সুজা দিল্লীরাজ্য অধিকার জন্য বঙ্গদেশ হইতে পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রাতে যাত্রা করিলেন। আওরংজেব এই সংবাদ পাইয়া দারাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধার্থ ফিরিলেন। সুজা গঙ্গা পার হইলে এলাহাবাদ ও ইটোয়ার মধ্যস্থলে কাজু-

হিং ১০৬৮
খৃ ১৬৫৮

য়াতে ছাউনি করিলেন। আওরংজেব তথায় উপস্থিত হইয়া তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। উভয় সেনা সম্মুখা-সম্মুখি হইয়া থাকিল, কিন্তু সংগ্রাম করিল না। ইতিমধ্যে সুজা ভ্রাতার পক্ষ রাজা যশবন্ত সিংহের সহিত মন্ত্রণা করিলেন দুইজনে একেবারে দুইদিগ হইতে আওরংজে-বকে আক্রমণ করিবেন। আওরংজেব এই মন্ত্রণার কিছুই জানিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবস প্রভাতে আওরং-জেব সৈন্য সজ্জা করিয়া যুদ্ধারম্ভের উদ্যোগ করিতে-ছেন, ঐ সময়ে যশবন্ত সিংহ পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে আও-রংজেবের পশ্চাতের সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সুজা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে পারিলেন না, এজন্য রাজা যশবন্ত একাকী কিছু করিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সসৈন্য অন্তরে গিয়া থাকিলেন। পরে দুই ভ্রাতার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সুজা পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্র মহম্মদ ও মিরজুমলা তাঁহাকে তাড়াইয়া চলিলেন।

দারা এই অবকাশে গুজরাটে গমন করিলেন, এবং তত্রস্থ শাসনকর্ত্তা তাঁহার পক্ষ হওয়াতে তিনি ঐ দেশের কর্ত্তা হইয়া রাজা যশবন্তের সহিত সম্প্রীতি করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যশবন্ত সিংহ অঙ্গীকার করিলেন তাঁ-হার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন। এই আশ্বাসে দারা তাঁহার নিকটে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত আওরংজেব তাঁহার

বুঝিয়া তাঁহাকে আপনার বশীভূত করিয়া

রাখিলেন, ভ্রাতার পক্ষে যাইতে দিলেন না। সুতরাং যখন দারা তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন না। দারা তাঁহার আশ্বাসে নিরাশ হইয়া আথান্তরে পড়িলেন। অগ্রপশ্চাৎ কোন দিগে যাইতে না পারিয়া আজমীরের পর্ব্বতে উঠিয়া চতুর্দ্দিগ গড়বন্ধন পূর্ব্বক থাকিলেন। আওরংজেব আগ্রা হইতে তথায় যাইয়া ক্রমাগত তিন দিন পর্ব্বতে তোপ করিলেন। তৎপরে যুদ্ধের আজ্ঞা দিলেন, এই যুদ্ধে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা হত হইলেন, এবং দারা একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

এই বিভ্রাটের পর দারা আট দিন আট রাত্রি অশেষ ক্লেশ পাইয়া, এবং মধ্যে২ অসভ্য লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অনুগত কতকগুলিন লোক সমভিব্যাহারে আহম্মদাবাদে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তত্রস্থ রাজা তাঁহাকে নগর প্রবেশ করিতে দিলেন না। দারা নিরুপায় হইয়া কচে যাত্রা করিলেন। কচাধিপতির সহিত পূর্ব্বে তাঁহার যথেষ্ট প্রণয় হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তখন তাঁহাকে হতাদর করিলেন। তাহাতে তিনি কান্ধারে যাত্রা করিয়া সিন্ধুর পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী জুইন রাজ্যে উপনীত হইলেন। পাঠানজাতীয় এক ব্যক্তি ঐ স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি দারার নিকটে বিধিমতে বাধ্য ছিলেন।

অতএব তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক রাখিলেন, কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া আওরংজেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দারা দিল্লীতে আগত হইলে, আওরংজেব তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া এক সামান্য হস্তী-তে আরোহণ করাইয়া সকল নগর ভ্রমণ করাইলেন। তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নগরস্থ লোকেরা নানাপ্রকার খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরদিন জুইনাদিপতি নগরে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া নগরস্থ লোকেরা চারিদিগ হইতে তাঁহার উপর প্রস্তর ও ঢেলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার প্রাণ যাইবার লক্ষণ হইয়াছিল কেবল প্রহরীরা তাঁহাকে রক্ষা করিল।

কিয়দ্দিবস পরে আওরংজেব এক সভা করিয়া আপন মতস্থ কতকগুলিন মৌলবীকে আজ্ঞা দিলেন, তাঁহারা দারার অপরাধের বিচার করেন। মৌলবীরা পূর্ব্ব উপ-দেশানুসারে বিচার করিয়া বলিলেন, দারা মুসলমান ধর্ম্ম বর্জ্জিত, অতএব তাঁহার প্রাণদণ্ড করা উচিত। এই ব্যবস্থা ক্রমে আওরংজেব দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। ঘাতক পুরুষেরা তাঁহাকে কারাগার হইতে আনয়ন ক-রিতে গিয়া দেখিল, পাছে কেহ বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করাইয়া তাঁহার প্রাণ বধ করে, এজন্য তিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়ে বসিয়া স্বহস্তে মসুর কলাই রন্ধন করিতেছেন। দারা ঘাতক পুরুষদিগকে দেখিয়া শস্ত্রপাণি হইয়া দাঁড়াইলেন। ঘাতক পুরুষেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি বীরের

ন্যায় তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে তাহারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া আওরংজেবের নিকটে লইয়া গেল, এবং তাঁহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া তাবৎ নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দারার ছিন্ন মস্তক আনীত হইলে, আওরংজেব তাহা ধৌত করিতে আজ্ঞা দিলেন। মস্তক ধৌত হইলে যখন তিনি দেখিলেন ঐ ছিন্ন মস্তক তাঁহার ভ্রাতার, তখন কপটভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাহা হুমায়ুনের গোরস্থানে নিখাত করিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহার পুত্রকে গোয়ালিয়রের দুর্গে চিরবন্দী করিয়া রাখিলেন।

রাজপুত্র মহম্মদ ও মিরজুমলা সুজার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ঐকবাক্য ছিল না, মিরজুমলা যাহা ইচ্ছা করিতেন, রাজপুত্র প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে ঘৃণা জন্মিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ তাতের সহিত প্রণয় করিলেন। সুজা ঐ প্রণয় দৃঢ় করণার্থ তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। আওরংজেব ইহা শুনিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে রাজকুমার মিরজুমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন মিরজুমলা রাজাজ্ঞা ক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দিলেন, তথায় তিনি চিরবন্দী হইয়া থাকিলেন। তৎপরে মিরজুমলা সুজার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সুজা প্রথমতঃ ঢাকাতে, তদনন্তর মগরাজ্যে, পলায়ন করিলেন। ঐ দেশে

তাঁহার এবং তাঁহার পরিজনগণের কি গতি হইল তাহা প্রকাশ নাই। মগরাজ তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি প্রবল।

ইতিমধ্যে শ্রীনগরের রাজা দারার পুত্র সলীমানকে কোন কারণ বশতঃ আওরংজেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আওরংজেব তাঁহাকে দিল্লীতে আনাইয়া তৎপিতার ন্যায় তাঁহাকে একটা সামান্য হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগর ভ্রমণ করাইলেন। সলীমান অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বীরবৎ আকৃতি অবলোকন করিয়া অনেকের অশ্রুপতন হইল। অনন্তর যখন রাজভৃত্যেরা তাঁহাকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া রাজসভাতে উপস্থিত করিল, আওরংজেব তাঁহার মনোহর রূপ দেখিয়া মনে মনে ব্যাকুলিত হইলেন। সলীমান বলিলেন মহারাজ আমার প্রাণ দণ্ডের ইচ্ছা করিয়া থাকেন করুন, তাহাতে আমার খেদ নাই, কিন্তু আমাকে যন্ত্রণা দান করিবেন না। আওরংজেব বলিলেন, সলীমান তোমার প্রাণদণ্ড করি ইহা আমার বাসনা নহে, কিন্তু তুমি রাজ্যলোভে আমার অনিষ্ট চেষ্টা না কর এজন্য আমার সাবধান হওয়া উচিত। ইহা বলিয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন, তথায় তিনি চিরবন্দী হইয়া থাকিলেন।

কিছুকাল পরে মুরাদ কারাগার হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। আওরংজেব তাহা শুনিয়া বিবেচনা

করিলেন যদি তিনি পলায়ন করেন তবে পুনর্ব্বার উৎপাত ঘটনার সম্ভাবনা। অতএব মনে মনে তাঁহার প্রাণদণ্ড কম্পনা করিয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন তিনি গুজরাট-দেশস্থ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার পুত্রকে ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন যে পিতৃহন্তা বলিয়া সে মুরাদের নামে অভিযোগ করে। রাজার উপদেশ মতে ঐ ব্যক্তি তাঁহার নামে অভিযোগ করিল। আওরংজেব ঐ সূত্রে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

এই রূপ রাজকুল নির্ম্মূল, অর্থাৎ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণকে সংহার ও কারারুদ্ধ করিয়া আওরংজেব সচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শত্রুমাত্র রহিল না। কিন্তু মিরজুমলা তৎকালে বঙ্গদেশের সুবাদার হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর্য্যবান। পাছে রাজ্য লোভ করেন এই ভয়ে তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্রের সান্নিধ্যে আসাম দেশে পাঠাইয়া ঐ দেশ জয় করিতে আজ্ঞা দিলেন। মিরজুমলা তরিযোগে আসামে গমন করিয়া ঐ দেশ জয় করিলেন, এবং তথা হইতে অহঙ্কার পূর্ব্বক রাজাকে পত্র লিখিলেন আমি এখান হইতে চীন দেশে যাত্রা করিব, ঐ দেশ অধিকার না করিয়া ফিরিব না। ইহা বলিয়া তিনি চীনদেশে গমন করিলেন। কিন্তু বর্ষারম্ভে তাঁহার সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্যাদি পাওয়া দুর্ঘট হইল, তৎপরে চীনদেশীয় লোকেরা চারি দিগ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অধিকন্তু, তাঁহার সৈন্যের মধ্যে মহামারী উপ-

স্থিত হইল। এই সকল কারণে তিনি তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া ঢাকাতে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় শ্রম ও পীড়াতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ঐ পীড়া কোন প্রকারে উপশম হইল না। তাহাতে তিনি সেইখানে কলেবর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আওরংজেব, তাঁহার পুত্র আমীনকে তৎপদাভিষিক্ত করিয়া বলিলেন তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু, কিন্তু তিনি অতি বীরপুরুষ ছিলেন, সুতরাং আমাকে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে হইত, তাঁহার পরলোক গমনে আমার সে শঙ্কা দূর হইয়াছে।

এবম্প্রকারে আওরংজেবের সকল শত্রু নিপাত হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সচ্ছন্দ মনে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার অত্যন্ত পীড়া জন্মিল, তখন বুঝিতে পারিলেন জীবন ও ঐশ্বর্য্য সকলি মিথ্যা। তথাপি লোভশূন্য হইতে পারিলেন না। কিয়দ্দিবস পরে রাজ্যের মধ্যে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা আরম্ভ হইল, কেহ কেহ পরামর্শ করিলেন তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া শাহজাহানকে পুনর্ব্বার সিংহাসনারোহণ করাইবেন। কেহ কেহ ধার্য্য করিলেন, আওরংজেবের দ্বিতীয় পুত্র মোউজমকে রাজ্যার্পণ করিবেন। কেহ বা তাঁহার তৃতীয় পুত্র আকবরকে রাজা করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। আওরংজেবের বুদ্ধি-কৌশলে সকল মন্ত্রণা বিফল হইল।

তদনন্তর আওরংজেব বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য কাশ্মীরে গমন করিলেন। এই সময়ে মোগলদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম যুদ্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা নামলব্ধ মনুষ্য ছিল না। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা অত্যন্ত প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়াছিল। অতএব এস্থলে তাহাদিগের পূর্ব্ব বিবরণ কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

নর্ম্মদার দক্ষিণে শৈলবলী অবধি যে দেশ আরম্ভ হইয়াছে তাহাই মহারাষ্ট্র দেশ। ইহার পূর্ব্বসীমা বরদা নদী, পশ্চিম সীমা সমুদ্র, এবং গোয়ার রেখা পর্য্যন্ত ইহার দক্ষিণ সীমা। ঘাটনামক পর্ব্বতশ্রেণী এই দেশের মধ্যদিয়া গিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে ভূখণ্ড আছে তাহাকে কনকান বলা যায়। ইহার প্রাচীন নাম পরশুরামক্ষেত্র। অতি প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে গুর্শি নামে এক বন্য জাতি বাস করিত। পুরাণে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহাতে লেখে গোদাবরী ও কাবেরীর মধ্যস্থিত দণ্ডকারণ্য রাবণের অধিকার ছিল, এবং তিনি রামন্ত্রী নামে এক বড়দাকর জাতিকে ঐ ভূমি দান করেন। বহুকাল পরে ভুগরা নামে এক নগর ঐ দেশে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। জনশ্রুতি আছে মিসর এবং যবন দেশ হইতে বণিকেরা এই স্থানে বাণিজ্যার্থ আসিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় শালিবাহন নামে কুম্ভকার জাতি এক ব্যক্তি অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়া এই সমস্ত দেশ অধিকার করেন, এবং

ডুগরা হইতে রাজধানী উঠাইয়া প্রতিস্থান নামক এক নগরে রাজধানী করেন। শালিবাহনের পূর্ব্বে কোশল অর্থাৎ অযোধ্যাদেশীয় সূর্য্যবংশীয় শিশুদেব নামক এক রাজা এই দেশে রাজত্ব করিতেন। শালিবাহন তাঁহাকে সবংশে বিনাশ করেন, কেবল একটী স্ত্রীলোক তাঁহার শিশু সন্তানকে লইয়া বিন্ধ্যগিরি মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। চিতোর এবং উদয়পুরের রাজারা সেই বংশোদ্ভব। মহারাষ্ট্রীয়েরাও সেই বংশীয়।

উপর হিন্দুস্থান বা দক্ষিণ অঞ্চলে আর আর হিন্দু-দিগের যেমন আচার ও ব্যবহার, মহারাষ্ট্রদিগের সে-প্রকার নহে। ইহারা খর্ব্ব ও মর্কটাকার, অত্যন্ত পরি-শ্রম-পারগ, অত্যন্ত চতুর, কাহার কথায় আপন স্বার্থ বিস্মৃত হয় না, এবং যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহার এক প্রকার শেষ না করিয়া ছাড়ে না। পূর্ব্বে ইহাদিগের রাজা বা রাজপাঠ ছিল না। তাহাদিগের প্রধানেরা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে গ্রাম বা জিলার প্রধানত্ব করিতেন। ইং-রাজী পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মুসলমানদিগের ইতিহাসে ইহাদিগের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত ছিল না, ষোড়শ শতাব্দীর পরার্দ্ধ অবধি বিজয়পুরের রাজারা পারস্য ভাষা রহিত করিয়া রাজসম্পর্কীয় কর্ম্মে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ব্যবহার, এবং যুদ্ধকর্ম্মে মহারাষ্ট্র দেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তাহাদের অশ্বারোহণে নৈপুণ্য দেখিয়া আর আর রাজারা তাহাদিগকে [illegible] কর্ম্মে নিযুক্ত

করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখনও তাহাদিগের নাম বড় প্রকাশ ছিল না। মালকাম্বর যে সময়ে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন সেই সময় অবধি তাহাদিগের নাম ব্যক্ত হইতে লাগিল।

মালকাম্বরের সময়ে যাদুরাও নামে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক প্রধান ছিলেন, তিনি আপনাকে রজঃপুত বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন, এবং দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া মালকাম্বরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মলাজী ভোঁসলা নামে এক ব্যক্তি উক্ত যাদুরাওয়ের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি দোলযাত্রার দিবসে সাহজী নামে তাঁহার এক পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র সমভিব্যাহারে যাদুরাওয়ের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। জিজিনামে যাদুরাওয়ের কন্যা তৎকালে তিন বৎসরবয়স্কা ছিলেন। যাদুরাও তাহাকে সাহজীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, কেমন জিজি! তুমি এই বালকটীকে বিবাহ করিবে। তদনন্তর সভাস্থদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, দেখ দেখি এই দুইটীতে কেমন সাজিয়াছে, এই পাত্র কন্যার উপযুক্ত বটে। এই কথা বলিবা-মাত্র মলাজী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তোমরা সাক্ষী, যাদুরাও আমার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু যাদুরাও মলাজী অপেক্ষা কুলীন ছিলেন, অতএব এই কথায় কুপিত হইয়া তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলিলেন। মলাজীর এমন সাধ্য ছিল না

যে, যাদুরাওয়ের সহিত সমান ভাবে চলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার ভাগ্যোদয় হইতে লাগিল। তিনি আহম্মদপুরের রাজাদের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুনাতে এক জায়গীর পাইলেন, এবং ক্রমে ধনবান্ ও পরাক্রমশালী হইলেন, তখন ভবিতব্যতাক্রমে যাদুরাও তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।

এই বিবাহের পরে সাহজী বিজয়পুরের রাজার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত যশস্বী হইলেন, এবং ঐ রাজা তাঁহাকে মহীশুরে এক জায়গীর প্রদান করিলেন। পরে জিজির গর্ব্ভে শম্ভুজী ও শিবজী নামে তাঁহার দুই পুত্র হয়। শম্ভুজীকে তিনি আপনার নিকটে মহীশুরে রাখিয়াছিলেন, শিবজী পুনাতে থাকিতেন। দাদাজী কামদেব নামে এক ব্রাহ্মণ পুনার জায়গীরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, তিনি তাঁহার রক্ষক স্বরূপ হইলেন। শিবজী অত্যন্ত চতুর ও সাহসিক ছিলেন, তিনি মুসলমানদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতেন, এবং বয়স্যগণের সাক্ষাতে সর্ব্বদা বলিতেন আমি মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া স্বাধীন রাজা হইব। দাদাজী তাঁহাকে সতত নিবারণ করিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিতেন না। অনন্তর তিনি দাদাজীর অধীনত্ব পরিত্যাগ করিয়া পিতার অশ্বারোহী সেনা এবং পর্ব্বতবাসী দস্যুদিগের সহিত মিলিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এইরূপে তিনি পর্ব্বতের সকল স্থান উত্তমরূপে অবগত হই-

লেন। ইহাও অনুমান করা গিয়াছে কনকান প্রদেশে যে সকল দস্যুবৃত্তি হইত তিনিই তাহা করিতেন। এই সকল কর্ম্মে তাঁহার সাহস ক্রমে আরো বৃদ্ধি পাইল। তিনি লুঠ ও বিবাদ লইয়া সর্ব্বদা কালক্ষেপ করিতেন।

কিছুকাল পরে দাদাজী পরলোক গমন করিলেন, তাহাতে পুনার জায়গীরের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনিই তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন, পিতাকে কিছুই পাঠাইতেন না। তৎপরে বিজয়পুরের রাজার সহিত তাঁহার ভাবান্তর হইল, তাহাতে তিনি একবারে কনকান অধিকার করিয়া বসিলেন। বিজয়পুরের রাজা শিবজীর দৌরাত্ম্য দেখিয়া তাঁহার পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্রকে বলিয়া পাঠাও এরূপ দৌরাত্ম্য আর না করে, যদি করে তবে কারাগারের দ্বার গাঁথিয়া তোমাকে তাহার মধ্যে পচাইয়া মারিব। এই আজ্ঞা শুনিয়া শিবজী সাহজাহানের শরণ লইলেন। সাহজাহানের আদেশে বিজয়পুরের রাজা তাঁহার পিতাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন।

অনন্তর, ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে, আওরংজেব দক্ষিণ রাজ্যে যাইয়া গোলকন্দার রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে শিবজী অতি অবাধ্য হইয়া মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ইহাতে আওরংজেব নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন, কিন্তু যখন তাঁহার জয়লাভের লক্ষণ হইল, তখন শিবজী তাঁহার শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি-

লেন। আওরংজেব তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, কিন্তু তিনিও দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, শিবজী বিজয়পুরের রাজার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। বিজয়-পুরের রাজা অপার্য্যমানে তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

হিং ১০৭৩ }
খৃ ১৬৬০ }

এই সন্ধিতে শিবজীর যথেষ্ট লাভ হইল। তিনি সমুদ্র তীরে গোয়া অবধি কল্যাণ-পর্য্যন্ত-কনকানের ১২৫ ক্রোশ ভূমি এবং ঘাট পর্ব্বতের উপরিভাগে পুনার উত্তর অবধি কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে মরিচ পর্য্যন্ত ৭৫ ক্রোশ ভূমি পাইলেন। এই রাজ্য প্রস্থে ৫০ ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহা পাইয়া শিবজীর আরো পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। ঐ সময়ে তাঁহার পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক এবং সাত সহস্র অশ্বারোহী সেনা হইয়াছিল।

বিজয়পুরের রাজার সহিত সন্ধির পর, শিবজী মোগল রাজ্য লুণ্ঠনে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন। এই উপদ্রবের কারণ কিছুই উপলব্ধ হয় না। যাহা হউক তাঁহার সেনাগণ লুণ্ঠন আরম্ভ করিলে, সায়েস্তা খাঁ নামে মোগল সেনাপতি আওরঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহার সকল সেনা ছিন্ন ভিন্ন এবং তাঁহাকে পরাজয় করিয়া, পুনাতে তাঁহার জায়গীর অধিকার করিলেন। শিবজী পরাজিত হইয়া সিংহগড় দুর্গে পলায়ন করিয়া থাকিলেন। সায়েস্তা খাঁ পুনা অধিকার করিয়া, তথায় শিবজী বাল্যাবস্থায় যে ঘরে বাস করিতেন সেই ঘরে বাসা করিলেন। শিবজীর বিলক্ষণ ভাবনা হইল সায়েস্তা খাঁর নির্বাতন

করেন, অতএব এক দিবস নগরে একটা মহাধুমধাম বিবাহ উপস্থিত হইলে, যখন বরযাত্রী লোকেরা রাত্রিযোগে নগর প্রবেশ করে, শিবজী সেই সময় পঁচিশ জন বলবান্ সেনা সমভিব্যাহারে বরযাত্রী স্বরূপ তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তাহার লোকেরা স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে রহিল। শিবজী নগর প্রবেশ করিয়া একেবারে আপনার বাটীর খিড়কী দ্বার দিয়া সায়েস্তা খাঁকে বধ করিতে গেলেন। সায়েস্তা খাঁ তৎকালে দোতালার উপর এক ঘরে বসিয়া ছিলেন। রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া শয়নালয়ের গবাক্ষে রজ্জু বন্ধন করিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক পলাইলেন। পলায়ন কালে শিবজী তাঁহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। যদি ঐ খড়্গ তাঁহার অঙ্গে লাগিত তাহা হইলে তিনি একেবারে দুই খণ্ড হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তাহা অঙ্গে না লাগিয়া তাঁহার হস্তে লাগিল, তাহাতে দুইটী অঙ্গুলী একেবারে উড়িয়া গেল। সায়েস্তা খাঁ পলায়ন করিলে পর তাঁহার পুত্র ও আর ২ যাহারা গৃহে ছিল শিবজী তাহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। তৎপরে তিনি নির্ব্বিঘ্নে পর্ব্বতারোহণ করিলেন। পর্ব্বতারোহণ কালে মশালের আলোকে তাবৎ পর্ব্বত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই দুঃসাহসিক কর্ম্মের পর শিবজী আরো সাহসিক হইয়া চারি সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীরে সৌরাষ্ট্র নগর আক্রমণ করিলেন। তৎকালে ঐ নগরে

রক্ষকাদি কেহ ছিলনা, তাহাতে তিনি ছয় দিবস পর্য্যন্ত ঐ নগর লুণ্ঠন করেন। আর ঐ সময়ে ইউরোপবাসী কত-গুলিন লোক তথায় কুঠী করিয়াছিলেন, শিবজীর সমভি-ব্যাহারী লোকেরা তাহাও লইবার বাঞ্ছা করিল কিন্তু পারিল না, তথাপি নগর লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইল। তাহাতে শিবজী রণতরী প্রস্তুত করিয়া সৌরাষ্ট্রে মোগল-দিগের বাণিজ্য-তরী লুঠ করিলেন। তৎপরে চারি সহস্র লোক সমভিব্যাহারে বিজয় পুরের রাজার অধিকার মধ্যে কানাড়ার এক বন্দর লুণ্ঠন করিলেন।

সৌরাষ্ট্র মক্কাগমনের পথ, এজন্য তাহা তীর্থস্থানের মধ্যে গণ্য। শিবজী ঐ স্থান আক্রমণ এবং যাত্রিদিগের নৌকাদি লুণ্ঠন করিলে, আওরংজেব অত্যন্ত রাগপ্রাপ্ত হইলেন। বিশেষ, পিতার মৃত্যুর পর শিবজী রাজা উপাধি গ্রহণ পুর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। আওরংজেব এই সকল অত্যাচার দেখিয়া তাহার দমন জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তাহারা শিবজীর তারবৎ দুর্গ অবরোধ করিল। শিবজী মোগল-রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া হঠাৎ জয়ী হয়েন এমন আকার ছিল না, অতএব, আওরংজেবের সেনাপতির সহিত সন্ধি বন্ধনের কথা উত্থাপন করিয়া আপন সৈন্যগণ দূরে রাখিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তৎপরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, তাহাতে এই লেখাগেল শিবজীর ৩২ দুর্গের মধ্যে

লিংশতি দুর্গ ও তৎসম্পর্কীয় তাবৎ ভূমি তিনি পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট দ্বাদশ দুর্গ জায়গীর স্বরূপ তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, এবং দিল্লীশ্বর তাঁহার মর্য্যাদার জন্য শম্ভুজী নামে তাঁহার পুত্রকে রাজসরকারে পঞ্চসহস্রী সেনাপতির পদ প্রদান করিবেন। এই সন্ধি-পত্র সাক্ষরিত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলে সম্রাট সকল বিষয় গ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু চৌথগ্রহণের বিষয়ে কোন আজ্ঞা দিলেন না।

অনন্তর শিবজী সম্রাটের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুরের রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে আওরংজেব তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিবজী তাঁহার আজ্ঞানুসারে দিল্লীতে গমন করিলেন। কিন্তু যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা তাঁহার উচিত মর্য্যাদা না করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য কেবল একজন সামান্য কর্ম্মকার প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর যখন তিনি রাজসভাতে উপনীত হইয়া সম্রাটের সম্মুখে নজর ধরিলেন, তখন কুশলাদি কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর মনুষ্যদিগের সহিত বসিতে আজ্ঞা দিলেন। আওরংজেব মনে করিলেন মানের খর্ব্বতা হইলে শিবজী আপনি নম্র হইবেন, কিন্তু এই সকল অপমানে তাঁহার অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বেদনা হইল। তিনি অপমানে সেইখানে মূর্চ্ছাগত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি বলিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম হানি হইলে মৃত্যু

খৃ ১৬৬৬

অপেক্ষাও অধিক যাতনা বোধ হয়, আমার মান হানিতে যে মনোবেদনা হইয়াছে মৃত্যু হইলেও সেরূপ বেদনা হইত না। ইহা বলিয়া তিনি সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। রাজপরিচ্ছদ গ্রহণের অপেক্ষা করিলেন না। রাজা তাঁহার আচরণে কুপিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা যায়, তিনি পলাইতে না পারেন।

শিবজী দেখিলেন তাঁহার বিধিমতে অপমান হইতে লাগিল, অতএব নিশ্চিন্তভাবে পলায়ন করিবেন এই মানস করিয়া, দিল্লীর জল বায়ুতে সঙ্গীলোকের পীড়া জন্মে এই ছলে সৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমে বিদায় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত যত অল্প লোক থাকে ততই ভাল এই বিবেচনা করিয়া আওরংজেব তাহাতে আপত্তি করিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল সঙ্গীরা প্রস্থান করিল। সঙ্গীদিগের প্রস্থানের পর শিবজী পীড়াচ্ছলে শয্যাবাসী হইয়া থাকিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে কএক জন দিল্লীনগরে গুপ্তভাবে থাকিল, হিন্দু কবিরাজ দিগের দ্বারা তাহাদিগের সঙ্গে শিবজীর কথোপকথন চলিতে লাগিল। শিবজী দিল্লীতে যাইয়া অবধি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর চারি পাঁচ চাঙ্গারি খাদ্যদ্রব্য অতিথ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। প্রহরীরা জানিত খাদ্যদ্রব্য যাইতেছে, অতএব চাঙ্গারি আটক করিত না। এক দিবস রাত্রে শিবজী আপনি এক চাঙ্গারিতে এবং পুত্রটিকে আর এক চাঙ্গারিতে বসাইয়া অনায়াসে বন্দিস্থান হইতে বাহির হইলেন, শয্যাতে এক

এক কিঙ্কর শয়ন করিয়া রহিল। প্রহরীরা কিছুই জানিতে পারিল না। পরে তাঁহার লোকেরা যে এক দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, শিবজী পুত্রসমভিব্যাহারে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া মথুরাতে পলায়ন করিলেন। তথায় পুত্রটীকে কোন বন্ধুর আলয়ে রাখিয়া আপনি মস্তক ও গোঁপদাড়ি মুণ্ডন করিয়া দণ্ডিবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে নয় মাসের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাঁহার পলায়নে আওরংজেব অত্যন্ত সশঙ্কিত হইলেন, বিশেষ তখন পর্য্যন্ত বিজয়পুরের যুদ্ধ শেষ হয় নাই, কি জানি ঐ রাজার সহিত যোগ করিয়া আর কোন উৎপাত করেন এই ভয়ে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাঁহাকে আর এক জায়গীর প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার রাজা-খ্যাতি দৃঢ় রাখিয়া তাঁহাকে ঐ যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন। শিবজী রাজার আজ্ঞাক্রমে বিজয়পুর ও গোলকন্দার রাজাদিগের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিয়া পরিশেষে তাঁহাদের স্থানে কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধের বিরতির পর শিবজী নিজ রাজ্যের যুদ্ধ ও রাজশাসন সম্পর্কীয় কতকগুলিন নিয়ম করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজস্ব সম্পর্কীয় সকল কর্ম্মের ভার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দিলেন। কৃষিলোকের প্রতি দৌরাত্ম্য না হয় অথচ কেহ রাজাকে রাজস্ব বঞ্চনা করিতে না পারে তাহার যে যে নিয়ম কর্ত্তব্য তাহা করিলেন। সৈন্যগণের ভূরি বেতন নিয়োজিত করিয়া তাহা রাজভাণ্ডার হইতে দিবার নিয়ম

করিয়া দিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রদানের নিয়ম রহিত করিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য সরকারে জমা হইতে লাগিল। সৈন্যদিগের প্রধানেরা দশ অবধি পঞ্চ সহস্র সেনার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়া রাজভাণ্ডার হইতে বেতন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, জায়গীর বা বৃত্তির বন্দোবস্ত রহিল না। এই সকল সুনিয়মে রাজ্য সমৃদ্ধ হইতে লাগিল।

আওরংজেব তাঁহার প্রতি ইদানীং যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই, তিনি আনন্দে বিহ্বল বা, অসতর্ক হইলে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে হস্তাধীন করিবেন, কিন্তু ধূর্ত্ত শিবজী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার চক্রে পাদক্ষেপ করিলেন না। অতএব আওরংজেব যে আশায় নৈরাশ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, ইহাতে তাঁহার মঙ্গল হইল না, যুদ্ধারম্ভ হইলে শিবজী সিম্রাটের শিবির আক্রমণ, সৌরাষ্ট্র পুনঃ লুণ্ঠন, এবং খন্দেশ প্রদেশ একেবারে উৎখাত করিয়া ফেলিলেন; অধিকন্তু তিনি সর্ব্বত্রে চৌথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আর যথাতথা যাইয়া রাজাদিগকে বলিলেন তোমরা আমাকে রাজস্বের চতুর্থাংশের একাংশ দাও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করিব না, যিনি না দিবেন তাঁহার রাজ্যলুণ্ঠন ও প্রজা বিনাশ করিব। এই ভয়ে [illegible] রাজারা তাঁহাকে চৌথ দিতে লাগিলেন, তাহাতেই চৌথ গ্রহণের রীতি হইল।

আওরংজেব শিবজীর সহিত যুদ্ধার্থ যে সৈন্য প্রেরণ

করিলেন তাহারা যুদ্ধ জয় করিতে পারিল না, তাহাতে তিনি পুনরায় অধিক সেনা পাঠাইলেন। শিবজী এপর্য্যন্ত মোগলদিগের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, ঝোপে ঘোপে থাকিয়া চোরাই মার মারিতেন, এবং লুঠপাট করিয়া বেড়াইতেন। এ যাত্রায় সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া

খৃ ১৬৭২ } মোগল সেনাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন।

ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত যশ হইল, এবং মোগল সেনাগণের অযশ হইল। আওরংজেব তৎকালে পূর্ব্ব উত্তর বাসী পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন, এ জন্য দক্ষিণের যুদ্ধ তাঁকিল না, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

আওরংজেব ক্রমাগত দুই বৎসর পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না, তিনি পাঠানদিগকে একেবারে বশীভূত করিতে পারিলেন না। তদনন্তর সাধুসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই সকল সাধু একেশ্বরবাদী, সত্যপরায়ণ, এবং জিতেন্দ্রিয়, মদ্যাদি পান করিতেন না। ভিক্ষা ও ভূমিকর্ষণ করিয়া কোন রূপে দিন পাত করিতেন। এই সম্প্রদায়ের এক সাধু দিল্লীর কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বাস করিতেন, তাঁহার কতক ভূমি ছিল, তাহার চাস আবাদ করিয়া তিনি উদরান্ন করিতেন। ফসলের সময়ে রাজপক্ষ পদাতিকেরা প্রহরীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, রাজকর না দিয়া কেহ ফসল লইয়া যাইতে পারিত না। কোন কথায় সাধুর সহিত প্রহরীর বিবাদ হইল, প্রহরী রাজপক্ষ আর আর

অনেক লোক আনিয়া সাধুকে অপমান করিল। সাধু সকল তাহা দেখিয়া দলবদ্ধ হইয়া রাজপক্ষ লোকদিগকে প্রহার করিল। ক্রমেই বিবাদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দেশস্থ তাবৎ লোক সাধুদিগের পক্ষ হইল। সম্রাট তাহাদের দমনার্থ সেনা সামন্ত পাঠাইলেন। সেনাগণ যুদ্ধসজ্জা করিয়া আসিল, কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। একটা জনরব উঠিল, সাধু সকল যাদুবলে যুদ্ধ করে, এবং কোন দেবী তাহাদের যুদ্ধ কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করে, তাহাতেই কেহ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন রজঃপুত সেনাগণ তাহাদিগের সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সুতরাং আওরংজেব অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এবং যাদু নাশের জন্য সকল সেনার গাত্রে এক এক কবজ বন্ধন করিয়া দিলেন। এই প্রকারে ঘোর সংগ্রাম হইতে লাগিল, অবশেষে মোগলেরা জয়ী এবং সাধুগণ পরাজিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আওরংজেবের চরিত্র।

যে সকল পাঠকেরা এই ইতিহাস মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তাহারা অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন পাঠান রাজারা যেমন হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন, তৈমুর বংশীয় রাজারা সে প্রকার ছিলেন না। আকবর হিন্দু রাজা-দিগের কন্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কুটুম্বিতা পর্য্যন্ত করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু রাজারা রাজ্যের অতি উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। আকবরের কয়েক জন উত্তরাধিকারীও সেই ধারাতে চলিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৌরাত্ম্য করিতেন না।

কিন্তু আওরংজেব সে ধারার মনুষ্য ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত শঠ এবং মুসলমান ধর্ম্মের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি প্রযুক্ত তাহার দোষাদোষ কিছুই বিবেচনা করিতেন না। অতএব রাজ্যারম্ভের কিছু দিন পরে সৌর বৎসর রহিত করিয়া চান্দ্র বৎসর পুনঃস্থাপন করিলেন। ইহা করিবার বিশেষ

তাৎপর্য্য এই পৌত্তলিকেরা সৌর বৎসর সৃষ্টি করে তাহাদিগের মতানুসারে মুসলমান শাস্ত্রের গণনা রহিত করা যাইতে পারে না। অনেক মুসলমান পণ্ডিত ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে চান্দ্র বৎসর কাল-সম্বন্ধয়িক নহে। কিন্তু তিনি কাহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ইহা ভিন্ন তিনি হিন্দুদিগকে ধুমধাম পূর্ব্বক প্রতিমা পূজাদি করিতে দিতেন না। এক ব্যক্তি মল্লা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি কতকগুলি অশ্বারোহি মনুষ্য সঙ্গে করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেন, পথঘাটে কাহাকে দেবার্চ্চনা করিতে দিতেন না। পরে তিনি হিন্দুপর্ব্বাদি একবারে উঠাইয়া দেন, এবং বড় বড় মেলাতে হিন্দুদিগের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে নিষেধ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি অনেক অল্প বুদ্ধির কর্ম্ম করেন। রাজসভাতে এক এক জন গণক থাকিতেন, এবং অনেক পণ্ডিত ও কবি বৃত্তি ভোগ করিতেন, তিনি তাহা রহিত করেন। এবং ইতিহাসলেখকের কর্ম্ম উঠাইয়া দেন, তাহাতে ইতিহাস লেখার প্রথা রহিত হয়। কিছুকাল পরে তিনি আজ্ঞা দেন মুসলমানেরা দ্রব্যাদির অর্দ্ধেক মাসুল দিবে, হিন্দুদিগকে সমুদায় দিতে হইবে এবং হিন্দুরা রাজসম্পর্কীয় কোন উচ্চ কর্ম্ম পাইবে না।

জাজিয়া নামে পৌত্তলিকদিগের উপর এক কর ছিল, আকবর তাহা রহিত করিয়া দিয়া ছিলেন, আওরংজেব সেই কর পুনঃস্থাপন করিলেন এবং তাহা সংগ্রহের

উৎকট নিয়ম করিলেন। এই করই অনর্থের মূল হইল। অনেকে অনেক রূপ বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কাহার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। এই কর পুনঃস্থাপনে রজঃপুত-দিগের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল, তাহাদের কিছুমাত্র প্রভু-ভক্তি রহিল না, এবং দক্ষিণ রাজ্যে রাজা প্রজা সকলেই প্রকাশ্য বা গোপনভাবে রাজবৈরী হইয়া হিন্দুধর্ম্মপালক শিবজীর পক্ষে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

এই বিদ্রোহিতার আর এক গুরুতর কারণ এই, জাজিয়া পুনঃস্থাপনের কিছুদিন পরে সিন্ধুপারে রাজা যশবন্ত সিংহের মৃত্যু হইল। তাহাতে তাঁহার ভার্য্যা দুইটী শিশু সন্তান লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু স্বধামে প্রত্যাগমনের জন্য রাজার অনুমতি লওয়া হয় নাই, বিশেষ রাজভৃত্যেরা নিষেধ করিলেও রাণী তাহাদের কথা না শুনিয়া সিন্ধুপার হইলেন। আওরংজেব এই সংবাদ পাইয়া রাণী ও তাঁহার দুইটী সন্তানকে অবরুদ্ধ করাইলেন, পরে আর ২ সকল লোক ও স্ত্রীলোক-দিগকে গমন করিতে অনুমতি দিয়া কেবল রাণী ও তাঁহার দুই পুত্রকে আটক করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞা অবহেলন করিয়া রাণীর পক্ষ সেনাধ্যক্ষ দুর্গাদাস, রাণী ও রাজকুমারদিগকে ছদ্মবেশে পাঠাইয়া দিলেন। একজন পরিচারিণী রাণীর বেশ আর দুইটী বালক রাজকুমার-দ্বয়ের বেশ ধারণ করিয়া রহিল। আওরংজেব ইহা জানিতে পারিয়া রাণী ও তৎপুত্রদিগকে পুনরানয়ন

করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেনাপতি হঠাৎ সে আজ্ঞা পালন করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন, এই অবসরে রাণী পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে যোধপুরে পৌঁছিলেন। আওরংজেব ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাদের সহিত রাজপুতদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহারা জয়ী হইতে পারিল না, মোগলদিগের হস্তে সকলে নিহত হইল।

কিন্তু রাজা যশবন্ত সিংহ কম সম্ভ্রমের মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহার সধর্ম্মিণীর প্রতি এই প্রকার অত্যাচার ও তীর্থ যাত্রার কর পুনঃস্থাপন করাতে সকল রাজপুত রাজারা একেবারে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া সংগ্রাম-সজ্জা করিতে লাগিলেন। উদয়পুরের রাজা এই যুদ্ধের অধ্যক্ষ হইলেন। আওরংজেব তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ স্বয়ং যাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। তখন রাজা কি করেন, তাঁহাকে স্বহস্তে লিখিয়াদিলেন তাঁহার অবাধ্য হইবেন না। কিন্তু আওরংজেব রাজধানী গমন করিবামাত্র তিনি পুনর্ব্বার অস্ত্রধারী হইলেন। সুতরাং আওরংজেব চতুর্দ্দিগ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। উদয়-পুরের রাজা সংগ্রামে অক্ষম হইয়া আরাবলী পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন, তাঁহার রাজ্য পড়িয়া রহিল। মোগল সৈন্যেরা তাহা লুঠ করিয়া লণ্ড ভণ্ড করিল। অনন্তর আওরংজেব রাজপুতদিগের গৃহদ্বার দগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিতান্ত নির্যাতন করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু রজঃপুতেরা নিতান্ত বীর্য্যহীন নহে, কেহ তাহাদিগকে আঘাত করিলে তাহারা তাহাকে এক ঘা না মারিয়া ক্ষান্ত হয় না। সম্রাট তাহাদিগকে যেমন নির্যাতন করিতে লাগিলেন, তাহারাও দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার দ্রব্যাদি বাহক পশ্বাদি ও সেনাগণকে রাত্রে ও সকালে আক্রমণ আরম্ভ করিল, এবং মধ্যে২ জয়যুক্ত হইতে লাগিল। আকবর নামে আওরঙ্গজেবের এক পুত্র ছিল, দুর্গাদাস তাহাকে সিংহাসন দেওয়াইব বলিয়া আপনাদের দলভুক্ত করিলেন। আকবর ৭০০০০ রাজসেনা লইয়া আজমীরে পিতার সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। তৎকালে আওরঙ্গজেবের কেবল এক সহস্র সেনা ছিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার পুত্রের সহিত যে সকল সৈন্য যুদ্ধার্থ আসিয়াছে তাহারা সকলে আপন ইচ্ছাতে রাজ বিপক্ষ হয় নাই, রাজপুত্র তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক আনিয়াছেন, অতএব অনায়াসে তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। সুতরাং রজঃপুতেরা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম না হইয়া প্রস্থান করিল। আকবর রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাগত হইলেন।

এই যুদ্ধে রজঃপুত ও মোগল উভয় জাতির অনেক অনিষ্ট হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আওরংজেব উদয়পুরের রাজার সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন। সন্ধিপত্রে জাজিয়া নামক করের কোন উল্লেখ থাকিল না। এই সন্ধি উদয়পুরের রাজার পক্ষে শুভকর হইল বটে, কিন্তু তাহার

পূর্ব্বাবধি রাজার সহিত তাঁহার যে মনোভঙ্গ হইয়াছিল তাহা দূর হইল না। আওরংজেব যত কাল রাজত্ব করিলেন তাবৎকাল মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইতে লাগিল।

এদিগে শিবজী ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকিলেন। বিজয়পুরের রাজার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই গোলযোগ শিবজীর বৃদ্ধির আর এক হেতু হইল। যেহেতু তিনি ঐ গোলের সময় তদ্রাজ্য, এবং তাহার দুই বৎসর পরে কনকানের অবশিষ্টাংশ এবং ঘাটপর্ব্বতের অধিকাংশ অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া আপনার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিলেন। ঐ রাজ্যাভিষেকে ভারি সমারোহ হইল। তদনন্তর তিনি আপনার কর্ম্মকারকদিগের পারসী নাম ঘুচাইয়া সংস্কৃত নাম দিলেন, এবং মুসলমান ধর্ম্মে আওরংজেবের যেমন অতি ভক্তি ছিল, তিনিও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি সেই প্রকার অচল ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন—সর্ব্বত্রে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী দেবার্চ্চনা ও ধর্ম্ম কর্ম্মাদি হইতে লাগিল।

হিং ১০৮২ } খৃ ১৬৭২ }

হিং ১০৮৪ } খৃ ১৬৭৪ }

ক্রমে শিবজীর এমন পরাক্রম হইল, তিনি নর্ম্মদা সংক্রমণ পূর্ব্বক মোগল অধিকার আক্রমণ করিয়া অনেক রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। তৎপরে মহীশূরে তাঁহার পিতার জায়গীর উদ্ধারের বাসনাতে গোলকন্দার রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া

হিং ১০৮৬ } খৃ ১৬৭৫ }

হিং ১০৮৭ } ত্রিশ সহস্র অশ্ব ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক
খৃ. ১৬৭৬ } সেনা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণানদী পার হইয়া মান্দ্রাজের সান্নিধ্যে সমুদ্র তট দিয়া জিঞ্জি নামক পর্ব্বতীয় দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিতমাত্র দুর্গস্থ সেনাগণ নিরস্ত্র হইল। তৎপরে তিনি ভিলোরের ও অন্য অন্য দুর্গ জয় করিলেন। এই প্রকারে তাবৎ জায়-গীর অধিকার হইলে, মোগলরাজ এবং বিজয়পুরের রাজা গোলকন্দার রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তাহাতে তিনি মহীশুর হইতে গোলকন্দাতে যাত্রা করি-লেন। মহীশুর বেঙ্কাজীর হস্তে রহিল, তিনি অঙ্গীকার করিলেন তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজস্ব দিবেন। শীবজী মহী-শুরে আসিয়া দেখিলেন গোলকন্দার রাজার সহিত মোগলরাজের সকল বিষয় মিটমাট হইয়া গিয়াছে। অতএব অষ্টাদশ মাসের পর তিনি রাজধানীতে প্রত্যা-গমন করিলেন।

পর বৎসর মোগলেরা বিজয়পুর আক্রমণ করিলে, বিজয়পুরের রাজা শিবজীকে আহ্বান করিলেন। শিবজী সাহায্য স্বীকার করিলেন। কিন্তু অনেক মোগল সেনা বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধার্থ আপনাকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া, তিনি মোগল অধিকার আক্রমণ ও লুট করিতে আরম্ভ করিলেন। এই আক্রমণে একবার তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল, তিনি মারা পড়িতে২ রক্ষা পাইলেন। তদনন্তর মোগলেরা নগর

বেষ্টন করিলে, তিনি তাহাদের আহার দ্রব্য আনয়নের পথ অবরোধ করিলেন, তাহাতে মোগল সেনাপতি নগর বেষ্টন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া গেলেন। এই কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ বিজয়পুরের রাজা শিবজীকে অনেক ভূমি দিলেন, এবং মহীশূরে তাঁহার জায়গীরের উপর আপনার যে স্বত্বাধিকার ছিল তাহা রহিত হইল।

পর বৎসর শিবজী পরলোক গমন করিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিজীবী চতুর এবং ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন। প্রথমে দস্যুদলাধিপতি থাকিয়া ক্রমে আপন বুদ্ধিবলে তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, তত্তুল্য পরাক্রম আর কোন হিন্দু রাজার ছিল না। তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে কি করিতেন বলা যায় না। আওরংজেবের ধর্ম্মভক্তি ও ভ্রান্তিই শিবজীর বৃদ্ধির মূল। শিবজী অতিবাদ নিষ্ঠুর ছিলেন না, সংগ্রামে জনপদের যে দুঃখ হইত তাহা তাঁহার সুনিয়মে দূর হইয়া যাইত।

শিবজীর মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী বন্দীবেশে ছিলেন। কথিত আছে শম্ভুজীর প্রচণ্ড স্বভাবপ্রযুক্ত শিবজী রাজারাম নামে দশ বৎসর বয়স্ক আর এক পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন। যাহাহউক শম্ভুজী সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়া রাইগড়ে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজারামের মাতাকে বধ ও রাজারাম ও তম্মন্ত্রিগণকে কারারুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর অনেকের

মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আপনি রাজা হইলেন। তদনন্তর তিনি ইন্দ্রিয় সুখের নিতান্ত বশীভূত হইলেন। তাহাতে কলুস নামে এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ রাজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা এবং তাঁহার লাম্পট্য কার্য্যের আচার্য্য হইলেন। শম্ভুজী বেশ্যা ও মদ্যে পিতার উপার্জ্জিত অতুল অর্থ নাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকল অর্থ নষ্ট হইলে তিনি ধনাভাবে নানা প্রকার অন্যায় কর স্থাপন করিলেন। ঐ করে প্রজারা নিতান্ত কুপিত হইয়া উঠিল, সৈন্যগণের বেতন দেওয়া কঠিন হইল। তাহারা বেতনাভাবে চতুর্দ্দিগে লুঠ আরম্ভ করিল। মহারাষ্ট্রদিগের অন্য২ রাজ্য লুণ্ঠন করিবার এই সূত্র হইল।

যখন শম্ভুজী ইন্দ্রিয় সেবাতে নিতান্ত বিহ্বল, তখন আওরংজেব, উদয়পুরের রাজার সহিত সন্ধিবন্ধনের পর দক্ষিণ রাজ্য একেবারে আপন কর্ত্তৃত্বাধীন করণ মানসে

খৃ ১৬৮৩ } তদ্দেশে উপস্থিত হইলেন। পরে বরহানপুরে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া রাজস্ব এবং জাজিয়া কর সংগ্রহের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন, তৎপরে আও-

খৃ ১৬৮৪ } রঙ্গাবাদে গমন করিয়া তথা হইতে স্বীয় পুত্র মোজাইমকে কণকানে পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন ঐ প্রদেশ লুঠ করিয়া একেবারে জনশূন্য করিবে। রাজপুত্র পিতৃ আজ্ঞানুসারে তাহাই করিতে লাগিলেন, তাহাতে কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধক হইল না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে

যেসকল অশ্ব ও বৃষ গিয়াছিল তাবৎ মারা পড়িল, এবং আহারাভাবে তাঁহার সৈন্যগণের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইল। তৎপরে যখন রাজপুত্র ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ঘাটপর্ব্বতে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, তখন মহামারী উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনেক সেনা পঞ্চত্ব পাইল। রাজকুমার বিপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

তৎপরে আওরংজেব বিজয়পুর ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করিয়া মোজাইমকে পশ্চিমদিগ এবং আজীম নামক আর এক পুত্রকে পূর্ব্বদিগ আক্রমণ করিতে আজ্ঞাদিলেন, আপনি আহম্মদ নগরে গমন করিলেন। কিন্তু মোজাইমের অধিক সৈন্য ছিল না, সেজন্য তিনি আক্রমণে অশক্ত হইলেন, সুতরাং আজীম অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সুযোগে শম্ভুজী রাজার পশ্চাদ্বর্ত্তি সকল স্থান লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন, এবং বরহানপুর দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

আওরংজেব বিজয়পুর আক্রমণ করিতে না পারিয়া গোলকন্দা রাজ্যের উপর ঝুকিলেন। গোলকন্দার রাজা, মদন পন্থ নামে এক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাতে ধর্ম্মভক্ত মুসলমানেরা অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিল। অতএব যখন দিল্লীশ্বরের সেনাগণ ঐ রাজ্যে উপস্থিত হইল, তখন এব্রাহেম নামে গোলকন্দা-রাজার প্রধান সেনাপতি রাজার সহায়তা না করিয়া অন্তরে রহিলেন। পরে একটা গৃহবিরোধ উপস্থিত হইয়া মদন

পন্থ হত হইলেন। এই ঘটনার পর রাজা পর্ব্বতশিখরে পলায়ন করিলেন। দিল্লীশ্বর হায়দ্রাবাদ লইয়া লণ্ড ভণ্ড করিলেন। তদনন্তর গোলকন্দার রাজা অনেক অর্থ দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির পর রাজসেনাগণ বিজয়পুরে যাত্রা করিয়া ঐ নগর বেষ্টন করিয়া থাকিল। রাজা অপার্য্যমানে পরাভব স্বীকার করিলেন। তদবধি ঐ রাজ্য একেবারে লোপ হইল।

তদনন্তর আওরংজেব গোলকন্দার রাজার মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক তাহার সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। রাজা সাত মাস পর্য্যন্ত দুর্গের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া থাকিলেন, তৎপরে তিনি পরাভব মানিলেন, তদবধি ঐ রাজ্য ধ্বংস হইল। অনন্তর আওরংজেব মহীশুরে সাহজীর জায়গীর হরণ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পরাক্রম বৃদ্ধি হইল না, বরং এই অবধি তাঁহার বলহ্রাস হইতে লাগিল, তাহা ক্রমে প্রকাশ হইবে।

এতাবৎ কাল শম্ভুজী কেবল ইন্দ্রিয় সেবাতে নিযুক্ত ছিলেন। অনন্তর এক সময়ে তিনি কয়েক জন বন্ধু সহবাসে কণকানে এক উল্লাসালয়ে উল্লাস করিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে এক মোগল সেনাপতি কতকগুলি সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিলেন। শম্ভুজী মদ্যপানে উন্মত্ত ছিলেন, পলাইতে পারিলেন না। কলুস তাঁহাকে

রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মোগল সেনাপতি উভয়কে বন্দীবেশে সম্রাটের সমীপে প্রেরণ করিলেন। আওরংজেব শম্ভুজীকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন। শম্ভুজী তাহা অবলম্বন না করিয়া কটু উত্তর করিলেন। আওরংজেব সেই ক্রোধে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। মন্ত্রীও ঐ দণ্ডের ভাগী হইলেন।

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রীয় প্রধানেরা সাহু নামে তাঁহার এক শিশু সন্তানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার পিতৃব্য রাজারামকে তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তা করিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে মোগল-সেনাগণ রাইগড় আক্রমণ করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক তাহা অধিকার করিয়া লইল, তাহাতে শিশুরাজ তাহাদের হস্তে পড়িলেন। মহারাষ্ট্রীয় প্রধানেরা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া এই ধার্য্য করিলেন রাজারাম কর্ণাট অন্তঃপাতি জিঞ্জির দুর্গে গমন করিবেন। এই পরামর্শানুসারে রাজারাম ছদ্মবেশে ঐ দুর্গে গমন করিলেন, এবং তথাকার রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। আওরংজেব এই সংবাদ পাইয়া জলফিকর নামে এক সেনাপতিকে বহু-সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ দুর্গ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। জলফিকর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গে যে সৈন্য আসিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ দুর্গ জয় করা কঠিন, অত-এব তিনি আরো সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। এবং

সৈন্যাগমনের অপেক্ষায় তিনি তানজোর ও অন্যান্য দেশে আপন সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা তথায় বল-পূর্ব্বক প্রজাগণের ধন হরণ করিতে লাগিল।

এই অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ বলা যাইতে পারে। রাজারাম মোগল সেনানিগের অত্যাচার দেখিয়া শম্ভাজী ও দানাজী নামে দুই প্রধানকে আজ্ঞা দিলেন, তাহারা মহারাষ্ট্র-দেশ প্রদক্ষিণ করিবেন। তাহাদিগের প্রতি আরো অনুমতি হইল তাহারা সর্ব্বত্রে চৌথ গ্রহণ করেন, এবং যে স্থান ইচ্ছা সকল স্থান লুঠ করেন। বিজয়পুর ও গোলকন্দার রাজাদিগের পুরাতন সেনাগণ ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইল। পরে সকলে একত্র হইয়া এক এক সম্প্রদায় এক এক দিগে যাইয়া সকল স্থানে লুঠ নরহত্যা ও নগর দাহ করিতে লাগিল। দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যে এমন স্থান রহিল না যেখানে দৌরাত্ম্য না হইল। লোকের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকিল না।

মোগল সেনাগণের সাধ্য হইল না এই সকল অত্যাচার একেবারে নিবারণ করিয়া উঠে। আকবরের সময়ে সৈন্যগণের সুন্দররূপ শিক্ষা হইত, তাহারা উত্তম-রূপে যুদ্ধ করিতে পারিত। সেনাধ্যক্ষ সকলও অতি দক্ষ ও সাহসী ছিলেন। এক্ষণকার সেনাপতিদিগের সেপ্রকার সাহস বা পরাক্রম ছিল না, কেবল তাহাদের বাবুগিরি অধিক হইয়াছিল। আর এক দোষ এই, মোগল সেনারা

বড় বড় ঘোড়াতে আরোহণ করিত, এই সকল ঘোড়ার ভারি ভারি সাজ ছিল। সেনাগণের পোশাকও অত্যন্ত ভারি ছিল, তাহাদের কোর্ত্তা সকল পলাত বা পলাতের জালে আচ্ছাদিত, ও হস্তে ও পৃষ্ঠে অনেক প্রকার অস্ত্র থাকিত। তদ্ভিন্ন জিন পোষের ভিতরে অনেক দ্রব্যাদি রাখিত। অশ্ব সকল আপনাদের ভারে ভারী, তাহাতে এই সকল ভার পৃষ্ঠে করিয়া অধিক দূর গমন করিতে পারিত না। বিশেষ, তাম্বু প্রভৃতি যেসকল নটবহর সঙ্গে যাইত তাহা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে হইলে মহা বিপদ হইত। ইহা ভিন্ন সেনাপতি ও অনেক সেনা-গণের পরিবারাদি সঙ্গে থাকিত, এবং তাম্বুর সঙ্গে দোকানী পশারি ও বণিক অনেক গমন করিত।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই সকল কিছুই ছিল না, তাহাদের সঙ্গে শুদ্ধ এক একটী ঘোড়া থাকিত। এই সকল ঘোড়া অতি সুশিক্ষিত, মাঠে ছাড়িয়া দিলে আপনি চরিয়া খাইত, এবং তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে তাহারা পবনাগ্রে দৌড়িত। সেনাগণের পোশাক অতি হালকা ছিল, অস্ত্রের মধ্যে একখান তলওয়ার ও একটী বন্দুক বা নয় দশ হস্ত লম্বা এক বর্শা থাকিত। ঘোড়ার পৃষ্ঠে স্বতন্ত্র আসন দিতে হইত না, পরিধেয় কয়েক খান বস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর এক খান কম্বল ভাঁজ করিয়া দিলে দিব্য আসন হইত, তাহাতে উড়ন পাড়ন সকল কর্ম্ম চলিত। আহারের জন্য বড় চিন্তা ছিল না, অন্য দ্রব্য না পাইলে

সেনারা চানা চর্ব্বণ করিয়া জঠর জ্বালা নির্ব্বাণ করিত। নিদ্রার ইচ্ছা হইলে ভূমিশয্যা করিয়া নিদ্রা যাইত, এক হস্তে অশ্ব রজ্জু ধরা, অন্য হস্ত মৃত্তিকাতে বিদ্ধ বর্শাতে সংলগ্ন থাকিত, প্রয়োজন মতে একেবারে লম্ফ দিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে বসিত। তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইত না।

মোগল সেনাগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহারা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিত। মোগল সেনা শ্রান্ত হইয়া ফিরিলে তাহাদের পশ্চাৎ পড়িয়া তাহাদিগকে সংহার লণ্ডভণ্ড ও নানাপ্রকারে বিরক্ত করিত। যদি দেখিত শত্রুসেনা কোন দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে তাহা হইলে রক্ষকদিগকে বধ করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিত। যদি জানিতে পারিত তাহাদের সঙ্গে অর্থাদি আছে, তাহা হইলে আরো যত্নবান্ হইয়া অর্থশুদ্ধ রক্ষকদিগকে একেবারে বেষ্টন করিত, কোন দিগে পলায়ন করিতে দিত না—পরে তাহাদের অশ্ব অর্থ ও আর আর দ্রব্যাদি লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিত।

মহারাষ্ট্রীয়েরা দক্ষিণ রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলে আওরংজেব জুলফিকর নামক সেনাপতিকে আজ্ঞা দিলেন, তিনি ঐ সকল অত্যাচার নিবারণ করেন। জুলফিকর দক্ষিণ রাজ্যে আগমন করিলে, শম্ভাজী ও সানাজী তাঁহার সৈন্যের পশ্চাৎভাগে যাইয়া হিন্দুস্থান হইতে তাহাদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহাতে তাহাদের আহারীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তির অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল।

এই সকল ক্লেশ নিবারণ বাসনায় আওরংজেব জিঞ্জি আক্রমণ জন্য কমবকস নামে তাঁহার আর এক পুত্রকে সুসজ্জিত করিয়া দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। আজ্ঞা দিলেন জলফিকর তাহার সহিত ঐক্য ভাবে কর্ম্ম করেন। এই আজ্ঞাতে জলফিকরের কিঞ্চিৎ মনঃপীড়া হইল, কেননা রাজপুত্রের অধীন হইয়া কর্ম্ম করেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে, অতএব মহারাষ্ট্রীয় রাজার সহিত মিলের চেষ্টায় থাকিলেন। রাজপুত্রেরও মনে মনে ঘৃণা হইল, তাঁহাকে জলফিকরের পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে, তিনি আপনি কিছু করিতে পারিবেন না। অতএব দানাজী বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে কর্ণাটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার সহিত সন্ধির কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার উভয়ের মনোবাদ উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বন্দোয়াসে যাইয়া রাজাকে পত্র লিখিলেন, নগর বেষ্টন করিয়া থাকিলেন না। আওরংজেব বিস্তারিত অবগত হইয়া জলফিকরকে আজ্ঞা দিলেন তাঁহাকে জিঞ্জির দুর্গ জয় করিতে হইবে, তাহা না হইলে তাঁহার কর্ম্ম থাকিবে না। এই আজ্ঞা পাইয়া জলফিকর মনোযোগী হইয়া দুর্গ জয় করিলেন, কিন্তু রাজারামকে ধরিতে পারিলেন না, তিনি সেতারাতে পলায়ন করিলেন।

হি ১১০৮ }
খৃ ১৬৯৮ }

অনন্তর দানাজী ও শন্তাজীর পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিবাদে রাজারাম শন্তাজীর পক্ষ হইলেন, কিন্তু

শম্ভাজীর সেনাগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিল। তখন রাজারাম স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক সেনা চলিল, এত মহারাষ্ট্রীয় সেনা ইহার পূর্ব্বে কখন একত্র গমন করে নাই। এই সকল সেনা লইয়া রাজারাম দক্ষিণ রাজ্যের উত্তরাংশ লুঠ করিয়া ঐ দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিলেন। আওরংজেব এপর্য্যন্ত ব্রহ্মপুরীতে ছিলেন। আপনি যুদ্ধ করেন নাই, সেনাপতিদিগকে পাঠাইতেন, তাহারা যাইয়া যুদ্ধ করিতেন। রাজারাম সংগ্রাম-সজ্জায় বাহির হইলে, তিনি সমুদায় সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন আপনি এক ভাগ লইয়া মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ সকল আক্রমণ করিবেন, জলফিকর অপর সেনা লইয়া প্রস্তুত থাকিবেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন যেখানে আসিবে তিনি সেই স্থানে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন।

এই প্রতিজ্ঞা করণানন্তর আওরংজেব ব্রহ্মপুরী হইতে যাত্রা করিয়া সেতারা আক্রমণ করিলেন। আক্রমণের কয়েক মাস পর সেতারা আয়ত্ত হইল। ইতিমধ্যে রাজারাম পরলোক গমন করিলেন। কিন্তু ইহাতে সমরের বিরতি হইল না। তারাবাই নাম্নী তাঁহার ভার্য্যা শিবজী নামে তাঁহার শিশু পুত্রের কর্ম্মকর্ত্রী হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আওরংজেব একে একে অনেক দুর্গ জয় করিলেন। এক একটা যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোরতর হইল। এই প্রকার পাঁচ বৎসর সংগ্রাম চলিল। জল-

খৃ ১৭০০

ক্তিকর যেসকল সেনা লইয়া গিয়াছিলেন তাহারা কতক যুদ্ধে মরিল, কতক ক্রমেং আতুর হইল, সুতরাং যুদ্ধক্ষম সেনা অতি অল্প রহিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ রক্তবীজের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং দক্ষিণ রাজ্য একেবারে ছার-খার করিয়া ফেলিল, কাহার কিছু রাখিল না। তাবৎ রাজ্য প্রায় মনুষ্য হীন হইল। এই কর্ম্মের পর তাহারা মালব ও গুজরাট যাইয়া সেই প্রকার লুঠ আরম্ভ করিল, এবং আপনাদের দুর্গ সকল ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করিল। পরে সম্রাটকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা নিয়ত তাঁহার ছাউনীর নিকট-বর্ত্তী থাকিত। রাজ-সেনাগণ ছাউনীর বাহির হইতে পারিত না, হইলেই তাহাদিগকে কাটিয়া লণ্ডভণ্ড করিত, এবং তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিতে দিত না। রাজ-সেনাগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলে তাহারা যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিত, এবং যে স্থান দিয়া যাইত সেস্থান দগ্ধ বা লুঠ করিয়া একাকার করিত। রাজ্যের রাজস্বও ক্রমে কম হইতে লাগিল, তাহাতে আওরংজেব ঠিক্ সময়ে সৈন্যগণের বেতন দানে অক্ষম হইলেন, সৈন্যেরা বেতন না পাইয়া সর্ব্বদা খিচমিচ আরম্ভ করিল। ইহা ভিন্ন রজঃপুত দিগের সহিত যুদ্ধ চলিতে ছিল, এবং জাঠ নামে আগ্রার সান্নিধ্যে আর এক জাতি ছিল, তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করা আবশ্যক হইল। এই সকল কারণে আওরং-

জেব মহাবিরক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার ঘরের সকল সন্ধান রাখিত, তাহাতে ভারি পণ করিয়া বসিল। আওরংজেব তাহাতে সম্মত হইতে না পারিয়া, সৈন্যগণকে লইয়া আহম্মদ নগরে গমন করিলেন। গমনকালেও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। আওরংজেব কোন প্রকারে তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। এই সকল চিন্তা ও শারীরিক রোগে তিনি ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল

খৃ ১৭০৭। ১ ফিব্রুয়ারি } হইতে লাগিলেন। পরে ৫০ বৎসর রাজত্বের পর, ৮৯বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিলেন।

আওরংজেব যেমন বুদ্ধিমান হউন, কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে তাঁহার রাজত্ব কালে রাজ্যের পরাক্রমের হ্রাস দশা আরম্ভ হয়। তদবধি ঐ পরাক্রম ক্রমে আরো ম্রিয়মাণ হইয়া আসিয়াছে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, একথা যথার্থ, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আওরংজেবের অত্যন্ত দ্বেষ ছিল, এবং হিন্দুদিগকে তিনি নিতান্ত ক্লেশ দিতেন, ইহাই অমঙ্গলের হেতু। বিশেষ ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয় জাতীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, ইহা দেখিয়া তাহাদিগকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্মে দ্বেষ করা উচিত ছিল না। তাহা করাতে হিন্দুদিগের কিছুমাত্র অনুভক্তি রহিল না, তাহারা সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিল। গোলকন্দা ও বিজয়

পুরের রাজ্য জয় করাতে কোন ফলোদয় হইল না। পরন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ এমন অশুদ্ধ ও সন্দিগ্ধ ছিল যে তাঁহার কথায় কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাঁহারি পুত্রেরাও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতেন না, ইহা অমঙ্গলের আর এক কারণ। বিশেষ, ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, এবং কাবুল ও পারস-স্থানে যে সকল ব্যাপার হইতেছিল তাহাতে রাজ্যরক্ষা করা বড় সহজ কর্ম্ম ছিল না।

যাহা হউক। এই দেশের মুসলমানেরা আওরংজেবের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন, বাবর বা আকবরের তাদৃশ প্রশংসা করেন না। তাঁহারা বলেন আওরংজেব অত্যন্ত সাহসী ক্ষমতাবান্ ও জ্ঞানবান্ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধূর্ত্তপনাই তাঁহার জ্ঞান। এই ধূর্ত্তপনাই তাঁহার অযশের মূল। তাঁহার প্রধান দোষ এই তিনি জন্মদাতা পিতাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই কর্ম্মের জন্য একবারও খেদ করেন নাই। তাঁহার মনে মনে সর্ব্বদা এই আশঙ্কা ছিল তিনি পিতার যে দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রেরা পাছে তাঁহার সেই প্রকার দুর্দ্দশা করেন এই ভয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি অনেক দুরূহ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু আপন সন্তানদিগের উপকারার্থ তাহা করিয়াছিলেন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বাহাদুর সাহ।

আওরংজেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র তুল্যাংশে রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবে; একজন দিল্লী ও তাহার উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজা হইয়া দিল্লীনগরে রাজধানী করিবেন, আর একজন আগ্রা ও তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশের রাজা হইয়া আগ্রাতে রাজধানী করিবেন, তৃতীয় পুত্র বিজয়পুর ও গোলকণ্ডার রাজা হইবেন। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজীম সে আজ্ঞা অবহেলন করিয়া আপনি রাজপদ গ্রহণ করিলেন। মোআজীম তৎকালে কাবুলে ছিলেন, তিনি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব, ভ্রাতা রাজা হইলে, তিনিও আপনার রাজ্যাভিষেক করাইলেন। সুতরাং উভয় ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহাতে আগ্রার দক্ষিণে একটা ঘোরতর সংগ্রাম হইল। এই যুদ্ধে আজীম ও তাঁহার দুই পুত্র হত হইলেন, এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র রণস্থলে বন্দী হইলেন। মোআজীম রণজয়ী হইয়া বাহাদুর সাহ নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আওরংজেবের তৃতীয় পুত্র কমবকস পিতার আজ্ঞানুসারে আপনাকে রাজ্যের তৃতীয়াংশের অধিকারী বিবেচনা করিয়া মধ্যমের প্রভুত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক দক্ষিণ রাজ্যের রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহাদুর সাহ রাজ্যেশ্বর হইয়া তদ্বিরুদ্ধে গমন করেন, তাহাতে হায়দ্রাবাদের নিকটে উভয়ে মহাযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে কমবকস পরাজিত ও হত হন।

তখন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবের বিরতি হয় নাই। তাহারা প্রবলভাবে চলিতেছিল। অতএব তাহাদের মধ্যে আত্ম কলহ উপস্থিত হয়, এই অভিপ্রায়ে বাহাদুর তাহাদিগের প্রকৃত রাজা সাহুকে মুক্তি দান পূর্ব্বক বলিলেন যদি তুমি আপনার রাজ্য উদ্ধার করিতে পার তাহা হইলে আমি তোমার সহিত সন্ধি বন্ধন করিব। সাহু কারা মুক্ত হইয়া রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে দুই দল হইল। এই দুই দলের মধ্যে সাহুর দল প্রবল হওয়াতে দাওদ খাঁ পালি নামে জলফিকরের পক্ষ যে এক প্রধান দক্ষিণের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তিনি সাহুর সহিত সন্ধি করিলেন, তাহাতে এই নির্দ্ধারিত হইল সাহু চৌথ পাইবেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহা লইতে পারিবে না।

এই সময়ে রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, পরে পঞ্জাববাসীদিগের সহিত মোগলদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একেকালে দুই যুদ্ধ নির্ব্বাহ করা কঠিন বিবেচনা

করিয়া বাহাদুর সাহ্ রজঃপুত্তদিগের সহিত সন্ধি করি-লেন, তাহাতে তাহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল। কিন্তু শিখ-দিগের সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এস্থলে শিখ জাতি-দের বিবরণ কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে, তৎপরে তাহাদের যুদ্ধের কথা বর্ণনা করা যাইবে।

শিখেরা নব্য জাতি। ইংরাজী পঞ্চ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানক নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তি রায়পুর গ্রামে কালুবেদী নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন, নানক তাঁহার পুত্র। তিনি প্রথমে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া শস্য বিক্রয় করিতেন, পরে কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম চিন্তায় ও ধর্ম্মোপদেশে মনঃ সংযোগ করেন। তৎকালে পঞ্জাব প্রদেশে রাজা ও রায় উপাধি-বিশিষ্ট যে সকল ভূস্বামী ছিলেন তন্মধ্যে এক ব্যক্তি নানকের সহায়তা করিতেন, তাহাতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শিখ গ্রন্থকর্ত্তারা সকলেই কহেন, বাল্যকালাবধিই নান-কের ধর্ম্মে মতি ও ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্তি ছিল, এবং তিনি অনেক প্রকার কঠোর তপস্যা করিয়া চরিতার্থ হইয়া-ছিলেন। ইহাতে বৈরাগ্য ভাব উপস্থিত হওয়াতে তিনি পিতার অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ-কর্ত্তারা ইহাও লিখিয়াছেন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধর্ম্ম চিন্তায় বিরত ও বিষয় ব্যাপারে রত করিবার নিমিত্ত

অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে বিরত করিতে পারেন নাই।

নানক সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া মক্কা মদিনা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, এবং নানা দেশে নানা স্থানে ঐশী শক্তি প্রকাশ পুর্ব্বক অনেক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে পঞ্জাবদেশে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশীয় লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, এবং অনেককে আপন মতে নিবিষ্ট করিয়া শিষ্য করেন। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ শিখ তদনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা শিখ নামে খ্যাত হইয়াছে।

নানকের মতে পরমেশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয়, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিত্য, সত্য, স্বয়ম্ভু, পরাৎপর ও বাক্য মনের অগোচর। এবং তিনি পরমেশ্বরকে অনাদি আদিম সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *।

তিনি শাস্ত্রানুসারে জীব আর যোনি ভ্রমণ ও শুভা-শুভ কর্ম্মানুরূপ উত্তমাধম জন্ম গ্রহণ অঙ্গীকার করিতেন। এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির অস্তিত্ব ও দেবত্ব স্বীকার

* তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয় তিনি হিন্দু-বেদান্তিক ও মুসলমান সুফি এই উভয়ের মত অনুধ্যান করিয়া স্বীয় মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শিখ-গ্রন্থকারেরা কহেন তিনি এক মুসলমান ফকিরের নিকট মুসলমান শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

করিতেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর আরাধনা করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন †।

তাঁহার মতে হিন্দু ও মুসলমানে কোন ভেদাভেদ ছিল না। মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসী সকলেরই পরমেশ্বরের উপাসনায় অধিকার এবং সকলেই তাঁহার প্রসাদ ভাজন। অতএব উভয় জাতিকে এক ধর্ম্মে নিবিষ্ট করেন ইহাই মানস করিয়া তিনি এক নূতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে জাতির বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ থাকে না, এবং হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিতে পরস্পর ঐক্য করিবার নিমিত্ত গোমাংস এবং বরাহমাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। আপনিও মাংস-ভক্ষণ ও জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নানকের মতে স্নান দান ও পরমেশ্বরের নামোপাসনা, এই তিনটী প্রধান কর্ম্ম। যদিও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিভেদের প্রথা উৎসেদ করিতে পারেন নাই, কিন্তু উক্ত প্রথার বিস্তর নিন্দা করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল বিষয়ে হিন্দুদিগের কিছু মাত্র আপত্তি ছিল না, এবং হিন্দু ও মুসলমান অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানেরা তাঁহার মত গ্রাহ্য

† তিনি লিখিয়াছেন অন্যের উপাসনা করিও না, দেবের সমীপে নত হইও না, প্রতিমা পূজা, তীর্থযাত্রা, অরণ্য-বনে বিজনে-বাস এ সমুদায়ই ব্যর্থ। এ সকল অনুষ্ঠান করিলে, তুমি গৃহীত হইতে পারিবে না। যদি নিষ্কৃতি চাও তবে সত্যের উপাসনা কর।

করে নাই, তাহারা তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিত। নানক তাহাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, অবশেষে তাহাদের কোপানলে পড়িয়া ৭০বৎসর বয়সে, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে, মুলতান অন্তঃপাতি কীর্ত্তিপুরে প্রাণত্যাগ করেন। তথায় ইরাবতী নদীর তীরে তাঁহার শরীর সমাহিত হয়।

নানকের মতাবলম্বী লোকেরা পূর্ব্বে অতি শান্তস্বভাব ছিল, কাহার হিংসা করিত না। মুসলমানেরা নানককে বিনাশ করিলে তাহারা হরগোবিন্দ নামে নানকের পুত্রকে আপনাদের অধ্যক্ষ করিল। কিন্তু তৎকালে মুসলমান রাজার রাজ্য, রাজা তাহাদের বিপক্ষ হইলেন। তাহারা রাজসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইল। ঐ সেনাগণ তাহাদিগকে লাহোর হইতে দূরীভূত করিল, সুতরাং তাহারা পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া উত্তর অঞ্চলের পর্ব্বতে পলায়ন করিল। সেখানেও মুসলমানদিগের সহিত তাহাদিগের শত্রুতা চলিতে লাগিল। পরে গুরুগোবিন্দ নামে হরগোবিন্দের পৌত্র, তাহাদিগকে একত্র

হিং ১০৮৫ }
খৃ ১৬৭৫ } করিয়া তাহাদিগের শিখ নাম দিলেন।

তাহাদিগের মধ্যে জাতি বা ধর্ম্মভেদ রহিল না, কি মুসলমান কি হিন্দু সকলেই এই দলভুক্ত হইতে লাগিল। এবং তাহাদিগকে দেখিলেই শিখ বোধ হয় এজন্য তাহারা সকলেই নীলাম্বর পরিধান করিল ও দাড়ি গোপ ও মস্তকের কেশ রাখিল। আরো এই বিধি হইল এই দলে ভুক্ত

হইয়া সকলে যুদ্ধ ও সর্ব্বদা অস্ত্র ধারণ করিবে। আর পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ ছিল তাহা রহিত হইয়া নূতন ক্রিয়ার বিধি হইল। ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম একবারে উঠিয়া গেল না, ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বরূপ মর্য্যাদা রহিল, গোমাংস ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ হইল।

কিন্তু এই সকল করিয়াও তখন শিখদিগের এমন বল হয় নাই যে রাজার সহিত যুদ্ধ করে। রাজসৈন্যেরা তাহাদিগকে মূষিকের ন্যায় তাড়াইয়া বেড়াইত, শিখ দেখিলেই বধ করিত, আবাল বৃদ্ধ কাহাকে ছাড়িয়া দিত না। কথিত আছে এই সকল দৌরাত্ম্যের নিমিত্ত গুরুগোবিন্দ অবশেষে মুসলমান রাজাদের চাকরি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি মুসলমান রাজারা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হন নাই। এই সকল অত্যাচার জন্য তাহারা স্বাধীন হইবার বাঞ্ছা করিল। গুরুগোবিন্দ বড় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু বন্দু নামে তাঁহার পর যিনি শিখাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তিনি অত্যন্ত প্রচণ্ডস্বভাব ছিলেন, তাঁহার শরীরে দয়া মাত্র ছিল না। তাঁহার সময়ে শিখেরা পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া পঞ্জাবের পূর্ব্ব অংশের ভাবদেশ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে এ প্রদেশ একবারে লোকশূন্য হইয়াছিল। তাহারা মনুষ্য ও জীবজন্তু কিছুই রাখে নাই। তদনন্তর তাহারা যমুনাতীরে সাহারাণপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, এবং তদবধি তাহারা শতদ্রু পার পর্য্যন্তে বাস করিয়া

তথা হইতে ক্রমে দিল্লীর নিকট পর্য্যন্ত লুঠ করিতে উদ্যত হয়। মোগলদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধের এই সূত্র।

শিখেরা দিল্লীলক্ষ্যে গমন করিলে বাহাদুর সাহ তাহাদিগের দমনার্থ চতুরঙ্গ সেনা প্রেরণ করিলেন। ঐ সেনাগণের গমনে শিখেরা শৈল শিখরে পলায়ন করিল। তথায় এক দুর্গ ছিল, বন্দু তাহা আশ্রয় করিয়া তন্মধ্যে থাকিলেন। তাহাকে ধরিতে পারিলে যুদ্ধ শেষ হইবে এই মনে করিয়া বাহাদুর দুর্গ বেষ্টন করিলেন, কিন্তু বন্দু এমন ভাবে পলায়ন করিলেন, বাহাদুর তাহা জানিতেও পারিলেন না। তদনন্তর তিনি লাহোরে প্রত্যাগমন

হি	১১২৪	করিয়া কিছুকাল পরে মানবলীলা সম্ব-
খৃ	১৭১২	রণ করিলেন। বাহাদুর সাহ অধিক
বং	২৮১৪	

বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, এজন্য পাঁচ বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারেন নাই।

জাহান্দর সাহ।

বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার জন্য তাঁহার দুই পুত্রে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ জাহান্দর সাহ ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন না, এজন্য সৈন্য ও সভাসদ্বর্গ তাঁহাকে রাজ্য না দিয়া তদনুজ আজীমকে রাজা করিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু জাহান্দর রাজা হইলে তাঁহাকে সাক্ষী গোপাল করিয়া আপনি কর্ত্তৃত্ব করি-

বেন এই অভিলাষে জলফিকর তাঁহার পক্ষ হইয়া আজী-মের সহিত সংগ্রাম করিলেন। এই সংগ্রামে আজীম পরা-জিত ও হত হইলেন। তাহাতে জাহান্দর সিংহা-সনারোহণ করিলেন। জলফিকর তাঁহার মন্ত্রী হইয়া একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। জাহান্দরের এক উপ-পত্নী ছিল, সে সামান্য নর্ত্তকী। জাহান্দর রাজা হইয়া তাঁহার আত্মীয়গণকে রাজ্যের প্রধান কর্ম্ম দিতে লাগি-লেন। ইহাতে তিনি সকলের অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেন। মন্ত্রীও তাঁহাকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিতে লাগিলেন।

যে যাহাহউক, জাহান্দর রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবার মানসে, রাজপরিবারের যাহারা তাঁহার রাজত্বে বিঘ্নদান বা রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে একে একে তাহাদিগকে সংহার করিলেন। কিন্তু ফরোখ-সাহ নামে আজীমের এক পুত্র বঙ্গদেশে ছিলেন, তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারিয়া, তদ্বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করি-লেন। ফরোখ সাহ পিতৃব্যের অত্যাচার দেখিয়া আবদুল্লা ও হুসন আলী নামে সৈয়দ গোষ্ঠীয় দুই ভ্রাতার শরণ লইলেন। ইহারা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, একজন এলাহাবাদের আর এক জন বেহারের সুবাদার ছিলেন। ইহাদের সাহায্যে ফরোখসাহ রাজপ্রেরিত সৈন্যগণকে দূরীভূত করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন। জাহান্দর এই সম্বাদ পাইয়া ৭০০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। জলফিকর তাঁহার

সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে চলিলেন। সংগ্রাম অতি ঘোরতর হইল। অবশেষে ফরোখসাহ জয়ী হইলেন, তখন জাহান্দর ছদ্মবেশে দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন কালে জলফিকরের পিতা আসদ খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তদনন্তর ফরোখসাহ আগ্রাতে উপস্থিত হইলে, তিনি ও তৎপুত্র জলফিকর মনে মনে বড়

হিং ১১২৪ } খৃ ১৭১৩ }

আশা করিয়া জাহান্দরকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু ফরোখসাহ তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া জাহান্দর ও জলফিকর উভয়েরই প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। আসদ প্রাণেং বাঁচিলেন।

ফরোখসাহ।

হিং ১১২৫ } খৃ ১৭১৩ } কং ৪৮১৫ }

ফরোখসাহ সিংহাসনারোহণ করিয়া আবহুল্লাকে রাজমন্ত্রী ও হুসন আলীকে আমীরল মলক, অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি করিলেন। ইহারা [illegible]তা মনে করিলেন রাজা রাজভোগে মত্ত থাকিবেন, আমরা কর্মকর্ত্তা হইয়া রাজকর্তৃত্ব করিব। কিন্তু ফরোখসাহ তাঁহা[illegible]র অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া [illegible]কে বয়সাকে মিরজুমলা উপাধি দিয়া তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং ঐ [illegible] ভ্রাতাকে দুই স্থানে রাখিবার

বাঞ্ছা করিয়া, হুসন আলীকে মাড়ওয়ারের রাজা অজিত সিংহের সহিত যুদ্ধার্থ পাঠাইলেন, এবং অজিত সিংহকে গোপন ভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, যুদ্ধ যাহাতে শীঘ্র শেষ না হয় তাহা করিবে। কিন্তু অজিত সিংহ তাহা না করিয়া, আপন মঙ্গল চিন্তায় সেনাপতির সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া এই লিখিয়া দিলেন, সম্রাটের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিবেন। এই সন্ধির পর হুসন আলী রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, ক্রমে রাজার সহিত মনোবাদ হইয়া, পুনরায় যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু রাজা নম্রতা স্বীকার করিলেন, তাহাতে ঐ যুদ্ধ ঘটিল না। অনন্তর এই ধার্য্য হইল মিরজুমলা বেহারের সুবাদার হইয়া যাইবেন, রাজধানীতে থাকিতে পারিবেন না। হুসন আপনার সৈন্য সামন্ত লইয়া দক্ষিণে যাত্রা করিবেন। আবদুল্লা মন্ত্রিপদে থাকিবেন। ইতি মধ্যে অজিত সিংহের কন্যা রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হুসন আলী তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিয়া অত্যন্ত ধুমধামে রাজার সহিত বিবাহ * দিলেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণে যাত্রা করিলেন, গমন কালে বলিয়া গেলেন আমি এখান হইতে চলিলাম। কিন্তু যদি শুনি কেহ আমার জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছে তবে

* ইহার পর হিন্দু রাজারা মুসলমান রাজাদিগকে আর কন্যা দান করেন নাই। এই দানই শেষ [illegible]

তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি এই খানে আসিয়া তাহার উচিত দণ্ড প্রদান করিব।

হুসন দক্ষিণে গমন করিলে, রাজা, দাওদ খাঁ নামে এক পাঠানকে তাঁহার বিনাশার্থ নিযুক্ত করিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিবেন, পরে আপনি তাঁহার সপক্ষ থাকিয়া কোন কৌশলে তাহাকে সংহার করিবেন। দাওদ খাঁ এত গোলমালের মধ্যে না যাইয়া আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। তাহার সৈন্যগণ এমন বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল যে, হুসনের সৈন্যগণ ঐ বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দাওদ খা তিন শত পাঠান সৈন্য লইয়া আপনি তাহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ ক্রমে, একটা গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তক ভেদ করিল, তাহাতে তিনি হত হইলেন; যুদ্ধ জয় হইল না। তদনন্তর হুসনআলী মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদের নিয়মানুসারে যুদ্ধ করিল, তিনি তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিলেন না। অনন্তর দিল্লী হইতে আজ্ঞা হইল তাঁহাকে তথায় যাইতে হইবে, তাহাতে যুদ্ধ শেষ করিতে না পারিয়া তিনি সাহুর সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে, আর ২ যে কথা লেখা থাকুক, একটা কথা এই থাকিল সাহু দিল্লীশ্বরকে দশ লক্ষ মুদ্রা কর প্রদান, সংগ্রাম কালে

পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সাহায্য, এবং দক্ষিণ রাজ্যে যাহাতে যুদ্ধাদি না হয় তাহা করিবেন। ইহা করিলে তিনি দক্ষিণ রাজ্যের সকল প্রদেশে চৌথ গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং রাজস্বের দশমাংশের এক অংশ পাইবেন। সম্রাট

খ্রিং ১১৩০ }
খৃ ১৭১৭ }

এই সন্ধি গ্রাহ্য করিলেন না, তাহাতে রাজার সহিত সৈয়দদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধের লক্ষণ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে শিখেরা পুনর্ব্বার দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিল, তাহাতে সম্রাটের পক্ষ এক দক্ষ সেনাধ্যক্ষ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিয়া তাহাদিগের অনেক প্রধান ২ লোককে রণবন্দী করিলেন। বন্দু নামে তাহাদিগের দলাধ্যক্ষ এই সময়ে ধরা পড়িলেন। মোগল-সেনাপতি অনেক শিখ-প্রধানকে সেইখানে বধ করিলেন, তৎপরে বন্দুকে সাতশত শিখ সমভিব্যাহারে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা দিল্লীতে আসিলে সম্রাট আজ্ঞা দিলেন তাহারা সকলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। শিখেরা তাহা স্বীকার করিল না, তাহাতে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া প্রতিদিন তাহাদিগের এক এক শত জনের মুণ্ড-চ্ছেদন হইতে লাগিল। বন্দুকে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া মস্তকে এক লাল পাগড়ী দিয়া এক লৌহ-পিঞ্জরে রাখা-ইয়াছিল। তাঁহার একটী সন্তান ছিল, সে নিতান্ত শিশু, রাজপুরুষেরা তাহাকে তাঁহার সম্মুখে আনাইয়া তাঁহার হস্তে একখান তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া আজ্ঞা করিল তুমি এই

অস্ত্র দ্বারা সন্তানকে বধ কর। বন্দু পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিলেন না, তাহাতে তাহারা ঐ পুত্রটীকে বধ করিয়া তাহার অস্থি ও শোণিত তাঁহার গাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিল। পরে লৌহশলাকা অগ্নিতে সিন্দূরবর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিগ হইতে তাঁহাকে বিন্ধিতে লাগিল। বন্দু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেং প্রাণত্যাগ করিলেন। যন্ত্রণা ভয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না। মুসলমানেরা আর২ শিখদিগকে বন্য পশুর ন্যায় তাড়াইয়া মারিতে লাগিলেন। অনেক শিখ যমালয় গমন করিল, কিন্তু তাহারা যে দল বাঁধিয়া ছিল তাহা ভঙ্গ হইল না, ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রাজমন্ত্রী আবদুল্লা অতি অলস ও সুখাভিলাষী ছিলেন, অতএব তাঁহার জ্যেষ্ঠ দক্ষিণ রাজ্যে গমন করিলে, তিনি এক হিন্দু প্রতিনিধির প্রতি সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া আপনি সুখ সম্ভোগে নিযুক্ত হইলেন। যে হিন্দু তাঁহার কর্ম্ম করিতেন তিনি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, কোন প্রকারে প্রভুর অন্যায় হইতে দিতেন না, ইহাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইলেন, সুতরাং পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রতি রাজার যে দ্বেষ ছিল তাহা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিশেষ মিরজুমলা ঐ সময়ে দিল্লীতে আসিয়া ছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রীর প্রাণ বধের মন্ত্রণা করিলেন। মন্ত্রী কি করেন, রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বীয় বন্ধু বান্ধব গণকে লইয়া আত্ম রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। মিরজুমলা তাঁহাকে বধ করিতে না পারিয়া স্বদেশ মুলতানে প্রস্থান করিলেন।

তাহাতে সম্রাট রাজা জয়সিংহ ও আর কয়েক জন প্রধানকে আজ্ঞা দিলেন তাঁহারা মন্ত্রীকে বধ করেন। তাঁহারা মন্ত্রীকে বিনাশ করিবার যত্ন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে হুসন দশ

হিং ১১৩১
খৃ ১৭১৯
কং ৪৮২১

সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সেনা সমভিব্যাহারে দিল্লীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নগরাধিকার করিয়া সম্রাটকে বধ করিলেন। ফরোখশাহ সর্ব্বশুদ্ধ সাত বৎসর রাজত্ব করেন।

মহম্মদ শাহ।

ফরোখশাহের মৃত্যুর পর সৈয়দেরা অল্পবয়স্ক দুই বালককে সিংহাসনে উপবেশন করান। ইঁহারা অল্পকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। তাহাতে তাঁহারা আর এক বালককে সিংহাসন দিলেন। এই বালক মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন।

মহম্মদের রাজত্ব কালে সৈয়দদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব রহিল। ইহাতে যাবতীয় প্রধানেরা অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অনেক স্থানে রাজ-বিদ্রোহ হইতে লাগিল। সৈয়দেরা এই সকল বিদ্রোহ দমন করিলেন বটে, কিন্তু আসফজা নামে তুর্কদেশীয় এক ব্যক্তি অতি [illegible] হইয়া উঠিলেন। এই ব্যক্তি আওরংজেবের অতি

প্রিয়, এবং ফরোখসাহের রাজত্বকালে দক্ষিণের সুবাদার ছিলেন। হুসেন ঐ প্রদেশের সুবাদার হওয়াতে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। তথাচ তিনি সৈয়দদিগের স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন নাই। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মতানুসারে চলিতেন, কিন্তু অবশেষে সৈয়দেরা তাঁহাকে মালবের সুবাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এই কর্ম্ম কোন মতে তাঁহার উপযুক্ত ছিল না, অতএব তাঁহার মনে২ ক্রোধোদয় হইয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তৎপরে দক্ষিণ রাজ্যে যাইয়া তথায় আপন প্রভুত্ব স্থাপন

হিং ১১৩২ }
খৃ ১৭২০ }

করিলেন। সৈয়দেরা তদ্বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিল। ইহাতে সৈয়দদিগের মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। মহম্মদের গর্ভধারিণী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন, মহম্মদ তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতেন। সৈয়দদিগের প্রতি তাঁহার অসদ্ব্যবহার ছিল না, কিন্তু যখন আসফজা জয়ী হইলেন, তখন মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া এক জন আমানের সহিত তাহাদিগের ক্ষমতা হ্রাসের মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইলেন। হুসেন এই মন্ত্রণার কথা জানিতে পারিয়া মনে মনে স্থির করিলেন রাজা ও তাঁহার মন্ত্রণাতে নিযুক্ত মন্ত্রীদিগকে লইয়া আমি দক্ষিণ দেশে যুদ্ধার্থে গমন করিব, আবদুল্লা পূর্ব্বমত দিল্লীতে থাকিবেন। ইহা হইলে আর কেহ কিছু করিতে পারিবে না।

এই সময়ে তিনি রণসজ্জা করিয়া আগ্রা হইতে যাত্রা

করিলেন, কিন্তু যেমন তিনি শিবিকা আরোহণ করিয়াছেন অমনি কালমক জাতীয় এক ভয়ানক পুরুষ হঠাৎ তাঁহাকে বিনাশ করিল। হুসনের মৃত্যুতে সৈন্যমণ্ডলী কম্পান্বিত হইল। সৈয়দ সকল রাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, কিন্তু রাজপক্ষীয় প্রধানেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। হুসনের মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে প্রকাশ হইলে আবদুল্লা আর এক ব্যক্তিকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন, এবং অনেক সৈন্য একত্র করিয়া আপনি মহম্মদের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহম্মদ সাহের সেনাগণ তাঁহাকে পরাস্ত ও রণবন্দী করিল। মহম্মদ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পীর বংশীয় বলিয়া তাহা করিলেন না।

মহম্মদ সৈয়দদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসফজাকে মন্ত্রি-পদ প্রদান করিলেন। আসফজা তৎকালে দক্ষিণ রাজ্যের কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, হঠাৎ ঐ প্রদেশ ছাড়িয়া আসিতে পারিলেন না। পরে রাজধানীতে আসিয়া দেখিলেন রাজা ইন্দ্রিয়-সেবাতে নিতান্ত বিহ্বল, তাঁহার উপপত্নী ও প্রিয়পাত্রেরা একাধিপত্য করিতেছে। এই সকল লোকদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব জন্মিল না। তাহারা আসফজার প্রাচীন বেশাদি দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এবং রাজাও তাঁহাকে আমোদ করিতে লাগিলেন। আসফজা বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর বৎসর দক্ষিণ রাজ্যে, সুতরা-

গমন করিলেন। গমন কালে মহম্মদ তাঁহার সহিত অনেক আত্মীয়তা করিলেন, কিন্তু তাহার পরে গোপনে গোপনে মবারক্ খাঁ নামে হায়দ্রাবাদের নবাবকে আজ্ঞা দিলেন তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করেন। মবারক খাঁ এই আজ্ঞা পাইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আসফজার সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি আপনি পরাজিত ও হত হইলেন। আসফজা তাহার ছিন্ন মস্তক রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর তিনি হায়দ্রাবাদে রাজধানী করিয়া তথায় রাজশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে২ সম্রাটকে উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার রাজপ্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না, প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরো সুশাসিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল। বালাজী বিশ্বনাথ নামে সাহু রাজার এক মন্ত্রী ছিলেন। চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী করকে মহারাষ্ট্রীয়দের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির মূল বিবেচনা করিয়া তিনি তাহা আদায়ের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ করিতেন। চৌথের বিষয়ে তাঁহার এমন আজ্ঞা ছিল প্রকৃত রাজস্বের চতুর্থাংশ গ্রহণ না করিয়া তোডলমল ও অলকাবর যে কর ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহারই চতুর্থাংশের একাংশ সংগ্রহ করিবে। এই কর সকলে দিতেন না, কিন্তু তথাপি তাহা ছাড়িতেন না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রধানের প্রতি এই কর আদায়ের ভার ছিল। তাহারা

তিনি যত কর আদায় করিবেন তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া ছিলেন। কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত অধিক কর আদায় করিতে দিতেন না, কেন না অধিক অর্থ একেবারে হস্তে আসিলেই অন্তঃকরণ লোভাসক্ত হইবার সম্ভাবনা।

বালাজী বিশ্বনাথের পেশওয়া খ্যাতি হইয়াছিল। ঐ খ্যাতি তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাজীরাও মন্ত্রী হইয়া ছিলেন। বাজীরাওয়ের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। শিবজীর পর তত্তুল্য মনুষ্য মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর দৃষ্ট হয় নাই। তিনিই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মোগল দিগের উপর আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলিয়া ছিলেন দিল্লী রসশূন্য বৃক্ষের তুল্য, ঐ বৃক্ষমূলে একেবারে আঘাত কর, তাহা হইলে শাখা পল্লব আপনি ঝরিয়া পড়িবে। রাজা তাহার পরামর্শানুসারে মোগলদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি দেন। তাহাতে বাজীরাও স্বয়ং মালবদেশ লুণ্ঠন করিয়া গুজরাটের সুবাদারের স্থানে চৌথ গ্রহণ করেন।

আসফজা মনে করিয়া ছিলেন তিনি বিনা বিঘ্নে রাজত্ব করিবেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার স্থানে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু হায়দরাবাদের চতুর্দ্দিকে যে

* মন্ত্রী ভিন্ন মহা[illegible] আর এক উচ্চ কর্মচারী ছিল তাহার নাম রাজপ্রতিনিধি। [illegible]

সকল স্থান ছিল তিনি তাহার চৌথ গ্রহণ করিতে পারি-লেন না। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়েরা উঁাহার স্থানে চৌথের দাবি করিলে, তিনি তাহার উত্তর দিলেন এই কর সাহু পাইবেন, কি (মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের কর্ত্তা) শম্ভু পাইবেন এপর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হয় নাই, অগ্রে এই বিষয় স্থিরীকৃত হউক, তাহার পর যাহাকে দিতে হয় দেওয়া যাইবে। আসফজা এই ছলনায় কর দান করিলেন না। বাজীরাও তাহাকে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বহরান পুর আক্রমণ করিলেন। আসফজা ও শম্ভু ঐ স্থান রক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া গুজরাট লুঠ আরম্ভ করিলেন। গুজরাট লুঠের পর দক্ষিণে যাইয়া আসফজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উঁাহার সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়নের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে আসফজাকে শম্ভুর পক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল; উঁাহার সহিত মিত্রতা রাখিতে পারিলেন না। দুই জন ভিন্ন হইলে, তিনি শম্ভুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া উঁাহাকে পরাভূত করিলেন, শম্ভু অবশেষে সাহুর প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। এই ব্যাপারের পর বাজীরাও ও আসফজা দেখিলেন যে উঁাহাদের পরস্পর বিবাদে আর কোন ফল নাই, অতএব পরস্পর যুদ্ধ না করিয়া উঁাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে দিল্লীশ্বর মহারাষ্ট্রীয় দিগের অত্যাচার দেখিয়া মালব ও গুজরাট রাজ্য রাজপুত রাজাদিগের

হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাজীরাও ঐ দুই রাজ্য পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন এবং সর্ব্বত্রে তাঁহার জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইল, তাহাতে তিনি অহঙ্কারপূর্ব্বক দিল্লীশ্বরকে দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন মালবরাজ্য ও মথুরা ও এলাহাবাদ ও বারাণস প্রভৃতি সকল নদীর সন্নিধে যে সকল দেশ আছে তাহা আমাকে জায়গীর স্বরূপ দান কর, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইব, নতুবা তাহা বল-পূর্ব্বক অধিকার করিব। দিল্লীশ্বর তখন এমন বলহীন হন নাই, যে বাজীরাওয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ঐ রাজ্য ছাড়িয়া দেন। অতএব তিনি মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। আসফজা তাহাদিগের মহা প্রতাপ দেখিয়া মনে২ ভয় পাইয়া প্রচ্ছন্ন সাহায্য দান করিলেন। কিন্তু তিনি না পৌঁছিতেই বাজীরাও আগ্রার বিংশতি ক্রোশ ব্যবধানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন মলহররাও হুলকার ঐ সময়ে যমুনা পার হইয়া অন্ত-র্ব্বেদে উৎপাত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অযো-ধ্যার শাসনকর্ত্তা সাদত খাঁ অযোধ্যা হইতে বাহির হইয়া দুই জনকে ঐ দেশ হইতে তাড়া করিলেন। ইহাতে একটা জনরব উঠিল, তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। বাজীরাও এই কথায় মনে২ হাস্য করিলেন, এবং স্বীয় চতুরতা দেখাইবার জন্য দ্রুত-গমনে রাতারাতি একেবারে দিল্লীর সম্মুখে যাইয়া উপ-স্থিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের লোকেরা তাঁহাকে হঠাৎ

তথায় দেখিয়া বড় শঙ্কিত হইল। কিন্তু বাজীরাও অনিষ্ট করেন এমন বাসনা করেন নাই। কেবল ভয় প্রদর্শন জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। অতএব যখন শুনিলেন, রাজ-মন্ত্রী সাদত খাঁর সহিত মিলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আর বিলম্ব না করিয়া দিল্লী হইতে একেবারে দক্ষিণে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

হি ১১৪৯ } খৃ ১৭৩৭ } কিছুকাল পরে আসফজা দিল্লীতে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়া, তাঁহার প্রতি সর্ব্ব কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন, এবং তাঁহার পুত্র গাজী-উদ্দীনকে মালব ও গুজরাট প্রদেশ দান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বাজীরাও অশীতিসহস্র অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার নর্ম্মদা পার হইয়া, উত্তরে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আসফজা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের কাণ্ড কারখানা ও কৌশল সকল জানিতেন, অতএব একেবারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া গোলন্দাজের প্রতি নির্ভর করিয়া ভূপালের নিকট এক উচ্চ স্থানে থাকিলেন। ভাবিলেন তাহারা আক্রমণ করিলে, তাঁহার গোলন্দাজেরা তাহাদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিবে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহা না করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকের দেশ উৎখাত করিতে লাগিল। আসফজা কোন স্থান হইতে আহারীয় দ্রব্য আনাইবেন তাহার পথ রাখিল না, চারিদিকের ঘাট

বাট বন্ধ করিয়া দিল। আসফজা এই ভাবে এক মাস থাকিলেন। তাহার পর তথায় তিষ্টিতে না পারিয়া পলা-য়ন আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, এবং নানামতে তাঁহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। আসফজা নিরুপায় হইয়া বাজীরাওকে লিখিয়া দিলেন চম্বল নদীর দক্ষিণে তাবদ্দেশ তোমাকে দেওয়া গেল। আরো অঙ্গীকার করিলেন এই দান রাজা যাহাতে গ্রাহ্য করেন তাহার বিধিমত চেষ্টা করিব। তদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু এই বিষয় গ্রাহ্য না হইতে হইতে আর এক ঘোর উৎপাত উপস্থিত হইল, তাহাতে রাজা প্রজা সকলে মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সুফাজী বংশীয় রাজারা পারস স্থানের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তিন শত বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন।

হিঃ ১১৩৫
খৃঃ ১৭২২

তাহার পর ক্রমে তাঁহাদের পরাক্রম হ্রাস হইতে থাকে। খিলজী নামধারী যে পাঠানেরা কান্দাহারের নিকট বাস করিত, হুসেন খাঁর রাজত্বকালে তাহারা কান্দাহার নগর অধিকার করিয়াছিল এবং পারস-দেশীয় রাজাদিগের সহিত সতত যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিত। হুসেন খাঁ রাজার রাজত্বকালে ঐ পাঠানেরা পারস স্থানের বিনাশ বাঞ্ছা করিয়া মহম্মদ নামে এক অতি সাহসিক ব্যক্তিকে আপনাদের অধ্যক্ষ করিল। মহম্মদ পঞ্চবিংশতি সহস্র বলবান্ যোদ্ধা লইয়া কান্দাহার হইতে পারস স্থানের রাজধানী ইস্পাহানে যাত্রা করিলেন। তিনি ঐ নগরের নিকটবর্তী হইলে, পারসীরা অনেক সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া ও অনেক কামান বন্দুক লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সুসজ্জ করিল। কিন্তু পর্ব্বতবাসী পাঠানদিগের সহিত পারিল না, পাঠানেরা জয়ী হইয়া ইস্পাহান রাজধানী অবরোধ করিয়া রহিল। নগরের মধ্যে অত্যন্ত

দুই লক্ষ লোক বাস করিত, তাহারা মধ্যে ২ পাঠানদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। পাঠান সেনা অধিক ছিল না, তথাপি তাহারা ইস্পাহান বাসীদিগকে ছিন্নভিন্ন করিল। এবং তাহাদের আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ দিতে লাগিল। ইস্পাহানেরা ছয় মাস পর্য্যন্ত এই ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিল। পরে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া পাঠানদিগের শরণ লইল, এবং তাহাদের রাজা অত্যাসদগণ বেষ্টিত হইয়া আসিয়া আপনার শির হইতে রাজমুকুট খুলিয়া মহম্মদের শিরে অর্পণ করিলেন।

মহম্মদ দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া উন্মাদ রোগে মরিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আসরফ নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা হইলেন। আসরফ অতি দক্ষ ছিলেন। অটমন তুর্কী ও রুষজাতীয়েরা সর্ব্বদা ঐ রাজ্যে উৎপাত করিত, আসরফ তাহা একবারে নিবারণ করিলেন। কিন্তু তৎপরে পারস্যস্থানে এক মহাবীর জন্মিলেন, তত্তুল্য বীর ঐ রাজ্যে আর কখন দেখা যায় নাই, তদ্বিবরণ এই।

তামাস্প নামে হুসেন সাহের এক পুত্র পাঠানদিগের আক্রমণ কালে ইস্পাহান হইতে পলায়ন করিয়া কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে কাজার নামে এক জাতির শরণাগত হইয়াছিলেন। যখন তিনি ঐ স্থানে বাস করেন তখন নাদের সাহ খোরাসান-দেশবাসী এক প্রধান, তাঁহার সহিত মিলিলেন। নাদের অনেক অনেক সাহসিক কর্ম্ম

করিয়া অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি রাজপুত্রের নিকটে আপনার সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষায় আপনাকে তামাস্প কুলি (অর্থাৎ তামাস্পের দাস) বিখ্যাত করিয়া, খিলজীদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। খিলজীরা তাহার রণদক্ষতায় পরাজয় মানিয়া পারস্যস্থান হইতে পলায়ন করিল। তামাস্প পারস্য স্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নাদের আরো২ অনেক যুদ্ধাদি করিলেন। ক্রমে উঁহার অত্যন্ত ক্ষমতা হইল। তখন পূর্ব্ব অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া তিনি তামাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি রাজমুকুট ধারণ করিলেন। উঁহার রাজ্যাভিষেকে অত্যন্ত ধুমধাম হইল, এবং তাহাতে যে যে ক্রিয়ার আবশ্যক সকলি করিলেন।

খৃ ১৭৩৬
১ জানুয়ারি

খিলজী পাঠানেরা পারস্যস্থানের নিতান্ত দুরবস্থা করিয়াছিল। নাদের রাজা হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহাদিগকে প্রতিফল দিবেন, এবং কান্দাহার রাজ্য তাহাদিগের হস্ত হইতে লইয়া পারস্যস্থানে পুনর্যোগ করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি কান্দাহার বেষ্টন করিলেন। খিলজীরা বহু-দিবসাবধি শত্রুভাবে বেষ্টিত থাকিল। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিল। তাহাতে নাদের শাহ কান্দাহার রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পাঠান রাজ্য অধিকার হওয়াতে, ভারতবর্ষ উঁহার রাজ্যের অতি নিকটবর্ত্তী হইল, যে হেতু কাবুল পর্য্যন্ত মোগল-দিগের অধিকার ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতবর্ষের

তাদৃক্ উত্তম অবস্থা ছিল না, ক্রমে বলহীন হইয়া আসিতেছিল। অতএব তিনি দিল্লীশ্বরকে বলিয়া পাঠাইলেন তুমি আমার প্রভুত্ব স্বীকার কর, নতুবা আমি তোমার রাজ্য বল পূর্ব্বক লইব। দিল্লীশ্বর তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না, তাহাতে নাদের সাহ কোন বিবাদ-সূত্রে কাবুল অধিকার করিয়া সিন্ধুনদে যাত্রা করিলেন। গমনকালে কেহ তাঁহার পথাবরোধ করিল না। তাহাতে তিনি যমুনা লক্ষে নির্ব্বিঘ্নে আসিতে লাগিলেন। পরে যখন তিনি দিল্লীর একশত ক্রোশ উত্তরে উপস্থিত হইলেন, তখন দিল্লীশ্বরের সেনাগণ তাঁহার পথাবরোধ করিল। কিন্তু নাদেরের সেনা যেপ্রকার অস্ত্রবদ্ধ ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল ভারতবর্ষীয় সেনাগণ সেরূপ ছিল না। অতএব তাহাদের এমত সাধ্য হইল না পারসী সেনাদের সহিত যুদ্ধ করে। অধিকন্তু ঐ সময়ে আসফজা ও সাদত খাঁয়ে সম্প্রীতি ছিল না, পরস্পর কেহ কাহার মঙ্গল বাঞ্ছা করিতেন না। অতএব তাঁহাদিগের সেনাগণকে নাদের অনায়াসে পরাজয় করিবেন, বিচিত্র কি। মোগল সেনারা যুদ্ধে পরাজিত হইলে মহম্মদশাহ নাদেরশাহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে আসিলেন। পারস্যস্থানের সেনাগণ অতি সুশিক্ষিত, অতএব দিল্লীতে আসিয়া তাহাদের কর্তৃক অধিক অত্যাচার হইল না। পরে একটা জনরব উঠিল নাদের শাহ মরিয়াছেন। তাহাতে লোকেরা একটা কোল

হিঃ ১১৫১
খৃঃ ১৭৩৯

তুর্দিগা ৭০০ পারসী সেনা বধ করিল। নাদের সাহ গোল নিবৃত্তির নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কোন মতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ যখন তিনি তন্নিবারণার্থে অশ্বারোহণ করিয়া নগরে গমন করেন, তখন অরিদিগহইতে তাঁহার উপর শর-বর্ষণ হইতে লাগিল। এই আক্রোশে তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার অনুরূপ সেনাগণ প্রাতঃকাল অবধি অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত দুই চক্ষে যাহাকে দেখিল তাহাকে বধ করিল, বালক স্ত্রীলোক বা বৃদ্ধ কাহাকে ত্যাগ করিল না। মৃতের সংখ্যা অনেক লেখকে অনেকরূপ লিখিয়াছেন, কেহ বলেন অর্দ্ধলক্ষ, কেহ বলেন লক্ষ, কেহ বলেন দেড়লক্ষ। কিন্তু ত্রিংশ চত্বারিংশ সহস্র লোক কাটা পড়িয়াছিল তাহার কোন সংশয় নাই।

কিন্তু কেবল রুধিরের জন্য নাদের সাহ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, তিনি অর্থ লোভে আসিয়াছিলেন, অতএব রাজালয়ে যুক্তবান্ যে সকল দ্রব্যাদি দেখিলেন সকল গ্রহণ করিলেন, এবং ধনবান্ ও গৃহস্থ লোকদিগকে মার পিট ও নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে লাগিলেন। সুবাদারদিগের উপর আরি ভি হইল, তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব দিয়া মুক্তি গ্রহণ করিলেন। এই রূপে নাদের সাহ ভারতবর্ষে ৫৮ দিবস বাস করিয়া অনুমান ত্রিশ কোটি মুদ্রা লইয়া পারস্যস্থানে পুনর্গমন

করিলেন। গমন কালে মহম্মদ সাহের সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন, তদ্দ্বারা এই স্থির হইল সিন্ধুপার সকল দেশ পারসস্থানের হইবে। সুতরাং এই অবধি আফগানস্থানে তৈমুর বংশীয় রাজাদের কোন আধিপত্য থাকিল না।

এই সময়ে রাজধানীতে লোকের যে দুর্গতি ও দুঃখ ও রাজ্যের যে দুরবস্থা হইল তাহা পাঠকেরা অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন, বর্ণন বাহুল্য। মহারাষ্ট্রীয়েরা হিন্দুস্থানে পড়িয়া সকল স্থানে আপনাদের পরাক্রম বৃদ্ধি করিবে এমন সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া বাজী-রাও ঐ সময়ে দক্ষিণ রাজ্যের যুদ্ধে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া আসফজার পুত্র নাসরজঙ্গের সহিত সংগ্রাম করিলেন। নাসরজঙ্গ তাহার সহিত ঘোর যুদ্ধ করিলেন। বাজীরাও এমন মনে করেন নাই নাসরজঙ্গ এমন যুদ্ধ করিতে পারি-বেন, অতএব তিনি তাহার সহিত মিল করিয়া হিন্দুস্থানে যাত্রা করিলেন। কিন্তু নর্ম্মদা পার হইতে না হইতে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বালাজীরাও তৎ-পদারূঢ় হইলেন। বালাজী অতি ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শত্রুগণও অতি বীর ছিলেন, তাহাদিগের পাকচক্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে। তাঁহার সমকক্ষের মধ্যে রঘুজী ভোসলা অতি ভয়ঙ্কর, তিনি বেরার ও তৎপূর্ব্ব জঙ্গল রাজ্যে চৌথ সংগ্রহ করি-তেন, তাহাতে ঐ অঞ্চলে তাঁহার এক প্রকার রাজার

ন্যায় আধিপত্য হইয়াছিল। তিনি বলপূর্ব্বক নর্ম্মদার উত্তরেও চৌথ গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। তাহাতে বালাজী স্বয়ং ঐ রাজ্যে গমন করিয়া আসফজীর কৃত সন্ধি পালনের জন্য ধুমধাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রঘুজী ভোসলা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। সম্রাট ভীত হইয়া বালাজীকে বলিলেন তোমাকে মালব রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে, তুমি রঘুজীকে আমার রাজ্যে উৎপাত করিতে দিওনা। বালাজী এই কথায় অতি আহ্লাদে বেহারদিয়া বঙ্গদেশের রাজধানী মুরশিদাবাদে গমন করিলেন, এবং রঘুজীকে পরাভব করিয়া বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিলেন। রঘুজী বঙ্গদেশের আশায় নিরাশ হইয়া সেতারা লক্ষ্যে গমন করিলেন। বালাজী তাঁহার পশ্চাৎ তথায় চলিলেন। কিন্তু ক্রমে অনেকে তাঁহার বিপক্ষ হইল, তাহাতে তিনি রঘুজীকে বাঙ্গলা ও বেহারে চৌথ গ্রহণের স্বত্ব ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর বঙ্গদেশের করের পরিবর্ত্তে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা ও কয়েক প্রদেশ দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

হিং ১১৫৬
খৃ ১৭৪৩

এই সময়ে আসফজা ও রাজাসাহুর মৃত্যু হয়। নাসীর জঙ্গ নামে আসফজার এক পুত্র স্বাধীনতার কল্পনা করিয়া দক্ষিণে রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন, আসফজা ঐ বিদ্রোহ দমন জন্য গমন করিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া তিনি, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে, পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে অনেক দ্বন্দ্ব উপস্থিত

হইয়াছিল, অবশেষে বালাজী পেশওয়া রাজারাম নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার সিংহাসনে অর্পণ করিলেন, তাহাতে ঐ সকল গোল নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তৎপরে বালাজী স্বয়ং রাজারামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ফরাশি জাতীয়েরা রাজারামের সহায়তা করিয়াছিল, ইহার বিবরণ অধ্যায়ান্তে দেখা যাইবে।

এই সময়ে রোহিলা জাতীয়েরা বড় বাড়িয়া উঠিল। রোহিলা-বাসী অনেক পাঠান রাজসরকারে কর্ম্ম করিত। ইহাদিগের মধ্যে আলীমহম্মদ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হিন্দু বংশোদ্ভব, কিন্তু এক রোহিলা সেনা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া প্রথমে এক সিপাহির কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে আপন বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলে অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া কতেকখান জায়গীর মহালের অধ্যক্ষতা করেন। এই কর্ম্মে থাকিয়া তিনি অনেক ঐশ্বর্য্য করেন, এবং অনেক পাঠানকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার আস্পর্দ্ধা দেখিয়া তদ্বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি ঐ সেনাগণকে পরাজয় ও লণ্ড ভণ্ড করিয়া গঙ্গা অবধি অযোধ্যা পর্য্যন্ত তাবৎ স্থানের অধিকারী হন। ইহাতেই ঐ স্থানের নাম রোহিলখণ্ড হয়। অনন্তর তাঁহার অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখিয়া দিল্লীশ্বর

খৃং ১৭৪৮ }
হি. ১১৬০ }

স্বয়ং তাঁহাদের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। মহম্মদ আলী তাহাতে রাজাধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক আপনি কেবল সরহন্দ রাজ্য রাখিয়া,

আর যেসকল রাজ্য ছিল, দিল্লীশ্বরকে সমস্তই সমর্পণ করেন।

কিন্তু ইহাতে ভারতবর্ষ একেবারে সচ্ছন্দ হইল না। নাদের শাহ এই রাজ্য হইতে পারস্য রাজ্যে প্রত্যাগমন

হিং ১১৬০
খৃ ১৭৪৭

করিয়া অত্যন্ত প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিল। হিরাট সান্নিধ্যে আবদালী নামে যে জাতিকে এইক্ষণে দুরানী পাঠান বলাযায়, আহম্মদ খাঁ নামে তাহাদের প্রধান নাদের সাহের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভুকে হত্যা করিলে তিনি হত্যাকারীদিগের দণ্ডের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারসী জাতীয়েরা সকলে এক জোট হইল, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। না পারিয়া তিনি সসৈন্যে আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় তাঁহার অত্যন্ত প্রতাপ ছিল, সুতরাং তিনি অল্প কালের মধ্যে কান্দাহারের রাজা হইলেন, এবং সিন্ধু অবধি পারসিস্থানের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য চলিল।

এই আহম্মদ খাঁ নাদের সাহের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া এই রাজ্যের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে ইহার আরো ধন-গৌরবের কথা শুনিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে মনে লোভ জন্মিল ভারতবর্ষের সম্রাট হইবেন। দ্বাদশ সহস্র সেনা-সমভিব্যাহারে তিনি সিন্ধুপার হইয়া লাহোর অধিকার করিলেন, তদপরে শতদ্রু নদো-

যাত্রা করিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী ও স্বীয়পুত্র আহম্মদকে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা শতদ্রুধারে সসৈন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন। আহম্মদ খাঁ তাহা দেখিয়া তথায় নদী সংক্রম না করিয়া আর এক স্থানে নদী পার হইলেন, তথা হইতে একেবারে তাঁহাদের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে আসিলেন। তৎপরে সরহন্দ অধিকার করিয়া রাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন,

হিং ১১৬১ }
খৃ ১৭৪৮ }

কিন্তু তাহারা তাঁহাকে পরাভব করিল। ঐ আহম্মদ খাঁ জয়ী হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার নদী পার হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

আহম্মদ সাহ।

সরহন্দের যুদ্ধের পর একমাস অতীত না হইতে২

হিং ১১৬১ }
খৃ ১৭৪৮ }
কং ৪৮৫০ }

মহম্মদ সাহ পরলোক গমন করিলেন। তাহাতে তৎপুত্র আহম্মদ সাহ সম্রাট হইলেন।

সরহন্দের যুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী হত হইয়াছিলেন, তাহাতে আহম্মদ সাহ সম্রাট হইয়া ঐ কর্ম্ম আসফজাকে দিতে চাহিলেন। আসফজা তাহা গ্রহণ করিলেন না, তাহাতে তিনি অযোধ্যার সুবাদার সাদত খাঁর পুত্র সফদরজঙ্গকে তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে আহম্মদ দুরানী স্বীয় রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশের যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, এবং আলীমহম্মদ পরলোক গমন করিয়া ছিলেন। তাহাতে নূতন মন্ত্রী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন এই সময়ে রোহিলাদিগকে নিপাত করিলে ভাল হয়। এই অভিপ্রায়ে তিনি ফরখাবাদের পাঠান সেনাপতিকে তৎকর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন, কিন্তু ঐ সেনাপতি যুদ্ধে হত হইলেন। সেনাপতির মৃত্যুর পর মন্ত্রী তাহার ভার্য্যাকে তাহার ঐশ্বর্য্যাদিতে বঞ্চিত করিয়া আপনি তাহার অধিকারের চেষ্টা করিলেন। ইহাতে তদ্দেশীয়েরা তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোহিলাদিগকে আহ্বান করিল। মন্ত্রী তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাগণ সুশিক্ষিত ছিলনা,

হিং ১১৬৩ }
খৃং ১৭৫০ }

তাহাতে রোহিলারা যুদ্ধ জয় করিয়া একে-বারে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

এই বিপদ কালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা ভিন্ন মন্ত্রির অন্য উপায় রহিলনা, অতএব হুলকার ও সিন্ধিয়া নামে মহারাষ্ট্রীয় যে দুই সেনাপতি পেশওয়ার স্থানে মালবদেশ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ছিলেন, তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন তোমরা আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর যে দেশ জয় করিবে, তাহাতে যে ধন পাওয়া যাইবে তাহা তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। এই লোভে মহারাষ্ট্রীয় প্রধানেরা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করি-

লেন, এবং জাঠ দিগের রাজাও তাঁহার পক্ষ হইলেন। এই সংযোজিত সেনা লইয়া তিনি রোহিলাদিগকে পরাজয় করিলেন। তাহারা একেবারে হিমালয়ের নিম্ন ভাগে পলায়ন করিল। সুতরাং তাবৎ রোহিলখন্দ দিল্লীর অধীন হইল। কিন্তু অর্থলোভী মহারাষ্ট্রীয়েরা ধনের

খৃ. ১১৭৩
হিং ১৭৭১

জন্য ঐ দেশ লুট করিয়া একেবারে শ্রীভ্রষ্ট করিল।

এই যুদ্ধের পর মন্ত্রী দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন আহম্মদ দুরাণী পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি আরো দেখিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে এক নপুংসক রাজমাতা ও রাজার অতি প্রিয় হইয়া রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছে। তাহাতে তিনি এক দিবস একটা মহা ক্রোধে নপুংসককে নিমন্ত্রণ করিয়া বধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার এক শত্রু নাশ হইল বটে, কিন্তু সাহবউদ্দীন নামে আসফজার পৌত্র, যাহাকে তিনি গাজী উদ্দীন উপাধি দিয়া আমীরল ওমরা পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন। এই ব্যক্তি অত্যন্ত বীর্য্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তিনি রাজপক্ষে হইয়া তাঁহার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই বিবাদ ছয় মাস পর্য্যন্ত চলিল, এবং ঐ ছয়মাস কাল দিল্লীর পথ ঘাট সর্ব্বদা শোণিতময় রহিল। অবশেষে একদল মহারাষ্ট্রীয় সেনা রাজার পক্ষে যাত্রা করিল, সেই সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রী সন্ধি বন্ধন পূর্ব্বক অযোধ্যার প্রস্থান

করিলেন। অতঃপর গাজীউদ্দীন রাজমন্ত্রী হইয়া জাঠদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এই যুদ্ধে রাজাও তাহার সঙ্গে গমন করিলেন, কিন্তু মন্ত্রী তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন না, রাজা তাঁহার অহঙ্কার ও দাম্ভিক আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এক দিবস শীকারচ্ছলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বশীভূত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দিল্লীতে আসিলেন। মন্ত্রী তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কতকগুলিন মহারাষ্ট্রীয় সেনা তাহার পশ্চাৎ পাঠাইলেন। তাহারা তাঁহাকে বন্দি বেশে রাজশিবিরে লইয়া আসিল। তথায় মন্ত্রী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল, তাঁহার এবং তন্মাতার চক্ষু উৎপাটন করাইলেন। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়

হিং ১১৬৭
খৃ ১৭৫৪

আলমগীর নাম দিয়া রাজপরিবারস্থ এক বালককে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।

আলমগীর, দ্বিতীয়।

আলমগীর সিংহাসনারোহণ করিলে, গাজীউদ্দীন পঞ্জাব উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধদ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিয়া ছলদ্বারা করিলেন। তদ্বিবরণ এই—পঞ্জাবের যিনি শাসন-কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বনিতা আপন এক শিশু সন্তানকে রাজা করিয়া আপনি রাজকর্ম্ম চালাইতে ছিলেন। ঐ বিধবার

এক কন্যা ছিল তাঁহাকে বিবাহ করিবার ছলে তিনি পঞ্জাবে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া একেবারে নগর আক্রমণ, এবং রাণীকে বন্দী করিয়া আনিলেন। আহম্মদ সাহ এই বিশ্বাসঘাতক আচরণের সংবাদ শুনিয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় একেবারে স্বসৈন্যে দিল্লীমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দিল্লীর বিংশতি ক্রোশ অন্তরে পৌঁছিলে মন্ত্রী তাঁহার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পঞ্জাবের রাণীও তাঁহার ক্ষমার জন্য অনুরোধ জানাইলেন, তাহাতে আহম্মদসাহ মন্ত্রীকে ক্ষমাদান করিলেন। কিন্তু শুদ্ধ মন্ত্রীর শাস্তিজন্য তিনি আইসেন নাই, ভারতবর্ষে গেলে অনেক অর্থ পাইব এই লোভে আসিয়াছিলেন, অতএব নাদের সাহের আগমন কালে দিল্লীতে যেমন লুট ও নর হত্যা হইয়াছিল সেই প্রকার হইল। আহম্মদ সাহ স্বয়ং বড় নিষ্ঠুর ছিলেন না, কিন্তু তিনি সেনাগণকে শাসন করিয়া রাখিতে পারিতেন না, সুতরাং তাহারা মথুরা লুঠ করিল, এবং তথায় যে সকল তীর্থবাসী ছিল তাহাদিগকে সংহার করিল। অনন্তর গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে তাঁহার সেনাগণের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল, অধিকন্তু তাহাদের গ্রীষ্ম সহ্য হইল না, তাহাতে আহম্মদ সাহ ভারতবর্ষে অধিক কাল তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। প্রত্যাগমন কালে তিনি তৈমুর বংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন, এবং রাজমন্ত্রী রাজার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারেন এজন্য

নজীবুদ্দৌলা নামে এক রোহিলাপ্রধানকে তাঁহার সেনা-

হি° ১১৭১
খৃ ১৭৫৭
কং ৪৮৫৮

পতি করিয়া রাজকর্ম্ম সম্পাদনের ধারা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

গাজীউদ্দীন এই সকল নিয়ম অমান্য করিয়া পূর্ব্বমত রাজবিরুদ্ধে চলিতে লাগিলেন, এবং আপনাকে নিতান্ত সবল বিবেচনা না করিয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এতাদৃক কর্ম্মে সতত অগ্রসর, অতএব গাজীউদ্দীন তাহাদিগকে আহ্বান করাতে পেসওয়ার সহোদর রাঘবজী উপযুক্ত সেনা লইয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া দিল্লী-নগর অধিকার করিয়া দুর্গবৎ রাজালয় বেষ্টন করিল। রাজ-সৈন্যগণ এক মাস ঐ আলয় রক্ষা করিল। তদনন্তর নজীবুদ্দৌলা তথা হইতে পলায়ন করিলে, রাজা দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া গাজীউদ্দীনকে পুনর্ব্বার মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। তদনন্তর রাঘবজী পঞ্জাব জয়ের চেষ্টাতে যাত্রা করিলেন। দুরানীরা তাঁহার আগমনে পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধু পার হইল। রাঘব বিনা বাধায় ঐ দেশ জয় করিয়া

হি° ১১৭২
খৃ ১৭৫৮

তথায় এক জন মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা রাখিয়া আপনি দক্ষিণে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমশঃ প্রবল হইলে, অযোধ্যার সফদর জঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দৌলা ও আরং মুসলমান রাজরাজড়েরা বিবেচনা করিলেন যে, তাহাদিগকে দমন না

করিলে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল, অতএব সকলে একত্র হইয়া যুদ্ধসজ্জা করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহা দেখিয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ পূর্ব্বক ঐ দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিল। সুজাউদ্দৌলা ঐ স্থানে হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া গঙ্গা অবধি তাড়াইয়া চলিলেন। বিশেষ আহম্মদ সাহ সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছেন তাহা শুনিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের মনে ২ মহা ভয় হইল, তাহাতে তাহারা সন্ধির প্রার্থনা করাতে মুসলমান সংযোজিত রাজপুরুষেরা তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। আহম্মদ সাহ তৎকালে স্বীয় রাজ্যের দক্ষিণাংশের বিলোচ জাতিদিগকে দমনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে দমন করা হইলে তিনি সিন্ধু নদের তীর দিয়া পেশওয়ারে গমন করিলেন। পেশওয়ারের নিকট সিন্ধু পার হইয়া বর্ষাপ্রযুক্ত পর্ব্বতের ধারে ২ যমুনা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় সিন্ধিয়ার অধীন এক দল মহারাষ্ট্রীয় সেনার উপর পড়িয়া তাহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড২ করিলেন। সিন্ধিয়া ঐ সঙ্গে হত হইলেন। হুলকার ঐ সময়ে আর এক দল অর্থাৎ অবশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয়-সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ মুখে পলায়ন করিতেছিলেন, দুরানী সেনাগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাবৎ মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিল।

হিং ১১৭৩ }
খৃ ১৭৬০ }

এই সময়ে গাজীউদ্দীনের মনে মনে ত্রাস জন্মিল যদি আহম্মদসাহ যুদ্ধে জয়ী হন তাহা হইলে দিল্লীর উজীরায়

প্রতি অত্যাচার করিবেন। অতএব তাহা না হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাজপরিবারস্থ আর এক রাজপুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। কিন্তু প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া মান্য করিল না। রাজার উত্তরাধিকারী সাহ আলম তৎকালে বঙ্গদেশে ছিলেন, তাঁহার বিবরণ উপযুক্ত স্থলে বিবরিত হইবে।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যন্ত বৃদ্ধি, হিমালয় অবধি কন্যাকুমারীয় অন্তরীপ পর্যন্ত প্রায় তাবৎ ভারতবর্ষ তাহাদিগের অধীন, এবং অনেক রাজা তাহাদিগকে কর প্রদান করিতেন। পেশওয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে তাহাদিগের পরাক্রম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগের অনেক অশ্বারোহী সেনা ছিল, তাহারা অত্যন্ত যুদ্ধ-পারগ, তদ্ভিন্ন অম্লান দশ সহস্র পদাতিক ছিল, ইহারা অনেকে করোমন্দলবাসী ইউরোপীয় লোকের নিকট যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিল। এই সকল সেনা, তদ্ভিন্ন তাহাদিগের তোপ কামান অনেক ছিল, তাহাতে তাহাদের মনে২ বড় অহঙ্কার জন্মিয়া ছিল, পৃথিবীতে আর কোন জাতি আমাদের তুল্য নহে। অতএব যখন তাহারা সিন্ধিয়া ও হুলকারের মৃত্যুর সংবাদ পাইল তখন একেবারে প্রতিজ্ঞা করিল ভারতবর্ষকে আর মোগলদিগের হস্তে রাখিব না, এ রাজ্য আমরা অধিকার করিব।

এই প্রতিজ্ঞা করণানন্তর পেশওয়া সদাশিব নামে তাঁহার

এক পিতৃব্যপুত্রকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বাসরাওও অনেক ব্রাহ্মণ ও মহারাষ্ট্রীয় প্রধান সেনাপতির সহিত যাত্রা করিলেন। সদাশিবরাও দিল্লীতে গমন করিয়া দেখিলেন দিল্লী রক্ষার্থ দুর্গে কেবল কতক গুলিন দুরাণী সেনা মাত্র আছে। দুর্গের একদিগে উপযুক্ত রক্ষক ছিলনা, তাহাতে তিনি সেইদিগ দিয়া দুর্গ প্রবেশ করিলেন। দুর্গরক্ষক সেনাগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের তোপের অগ্রে স্থির থাকিতে পারিল না। দুর্গ প্রবেশ করণানন্তর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বাজার ও আর আর স্থানে যে সকল মুল্যবান দ্রব্য ছিল তাহা লুঠ

হিং ১১৭৪	
খৃ ১৭৬০	
কং ১৮৩২	

করিলেন, এবং রাজার অপূর্ব্ব সিংহাসন ও রাজসভার কড়িকাষ্ঠ আচ্ছাদিত রজতাদি ভাঙ্গিয়া লইলেন। তদনন্তর তিনি বিশ্বাস রাওকে রাজা করিবার মানস করিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত দুরাণী সেনারা দিল্লী নগরে ছিল, এজন্য তাহা করিতে না পারিয়া মনে২ স্থির করিলেন তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন।

জাঠদিগের রাজা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাঁহারা তোপ কামানাদি ও পদাতিক সেনাগণকে তাঁহার দেশে রাখিয়া কেবল অশ্বারোহী সেনা লইয়া যুদ্ধার্থে গমন করেন, তাহা হইলে গ্রীষ্ম ঋতুর সমাগমে দুরাণীরা এ দেশ হইতে প্রস্থান করিলে তাহারা সচ্ছন্দে রাজ্য অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু মহা-

রাষ্ট্রীয় সেনাপতি সে পরামর্শ না শুনিয়া সকল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। আহম্মদ সাহ তৎকালে অযোধ্যার নিকট ছাউনি করিয়া সুজাউদ্দৌলা ও আর ২ মুসল্মান রাজাদিগের সহিত রাজ্য রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। বর্ষান্তে সৈন্য সঞ্চালনের সময় হইলে তিনি সসৈন্যে দিল্লী নগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া পাণিপতে পলায়ন করিলেন, এবং ঐ স্থানের চারিদিগে কামান সাজাইয়া সৈন্যগণকে তন্মধ্যে রাখিলেন। এই সময়ে সদাশিব রাওয়ের ৭০০০০ অশ্বারোহী এবং ১৫০০০ পদাতিক সেনা, ইহারা অতি সুশিক্ষিত, তদ্ভিন্ন ২০০ কামান ও প্রাচীর ভাঙ্গিবার যন্ত্র ও গোলাগুলি অসঙ্খ্য, সুতরাং সৈন্য, গোলন্দাজ ও ভৃত্যাদিতে তাঁহার সঙ্গে প্রায় দুই লক্ষ মনুষ্য ছিল। আহম্মদ সাহের সঙ্গে ৪০০০০ পাঠান ও পারশী সেনা ১৩০০০ এতদ্দেশীয় ঘোড়সওয়ার, এবং ৩৮০০০ ভারতবর্ষীয় পদাতিক, তন্মধ্যে রোহিলা জাতিই অধিক। ইহা ভিন্ন ৩০টী কামান ও কতক গুলি প্রাচীরভাঙ্গা যন্ত্র ছিল। আহম্মদ সাহ এই সেনা লইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের ছাউনির নিকট শিবির স্থাপন করিয়া থাকিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। ইতিমধ্যে এক দল, অর্থাৎ ১২০০০, মহারাষ্ট্রীয় সেনা যমুনার ধার দিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া খাদ্যাদি আনয়নের পথ

আটক করিল। তাহার অত্যাচারে তাঁহার সেনাগণের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। এই ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার কতক গুলিন সেনা মহা-রাষ্ট্রীয় সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে একেবারে সমূলে বিনাশ করিল, এক প্রাণিকেও রাখিল না। তদনন্তর তাহারা তাবৎ বহির্দ্দেশ অধিকার করিল, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আহারীয় দ্রব্য আনয়নের ব্যাঘাত জন্মিল। মধ্যে মধ্যে দুই সেনাতে মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা দুরাণী সেনার শ্রেণী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আহম্মদ সাহের বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন শীঘ্র সংগ্রাম করুন, তাহা হইলে যাহাহয় একটা হইয়া যায়, বিলম্ব করিয়া ফল নাই। আহম্মদ সাহ উত্তর করিলেন তোমরা যুদ্ধের বিষয় বুঝ না, অন্য বিষয়ে তোমাদের যে ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু এবিষয়ে আমি যাহা ভাল বুঝিব তাহা করিব। তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন তোমরা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাও, আমি উপস্থিত থাকিতে তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই। বস্তুতঃ তিনি অনেক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, সৈন্য রক্ষার জন্য প্রায় সমস্ত দিবস অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতেন।

সদাশিব রাও মনে করিয়াছিলেন তিনি আহম্মদ সাহের সহিত সন্ধি করিবেন, এবং সুজাউদ্দৌলঃ দ্বারা তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। আহম্মদ সাহ সন্ধি করিলেন না। সন্ধির আশায় নৈরাশ হইয়া

তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয়ী হইতে পারি ভাল, নতুবা প্রাণ দিব, কিন্তু সৈন্যগণ অনাহারে মরিবে তাহা দেখিতে পারিব না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ১৭৬১ সালে ৬ই জানুয়ারি প্রত্যূষে তিনি সৈন্যসজ্জা করিয়া প্রথমে কামান সকল সারি সারি রাখাইলেন, অভিপ্রায়, তদ্দ্বারা শত্রু-শ্রেণী ভঙ্গ করিবেন। আহম্মদ সাহ তাঁহার মনস্থ জানিতে পারিয়া আপন শিবিরের সম্মুখে সৈন্যগণকে দণ্ডায়মান করাইলেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয়েরা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ সকল গোলা শূন্য দিয়া চলিল, আহম্মদ সাহের সৈন্যগণের অঙ্গ স্পর্শ করিল না। তাহাতে মহা-রাষ্ট্রীয় পদাতিক সেনাগণ বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া দক্ষিণ ভাগে রোহিলাদিগকে কাটিয়া একাকার করিল। তৎপরে শত্রুসেনার পার্শ্ব ভাগে দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্য দেশ আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ও বিশ্বাসরাও অশ্বারোহী সেনা লইয়া ঐ সময়ে প্রচণ্ড বেগে তাহা-দিগের উপর পড়িল। আহম্মদ সাহ মহা বিপদ দেখিয়া পশ্চাতের দলবদ্ধ সেনাগণকে আনাইলেন, তাহাতেও যুদ্ধ সারিল না, মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল ভাবে রহিল। অতএব তিনি সকল সেনা একত্র করিয়া শ্রেণীপূর্ব্বক অগ্রে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞা পাইয়া কতক সেনা চক্রাকারে যাইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের পার্শ্ব দেশ ঘেরিল, ইহাতে তাবৎ মহারাষ্ট্রীয় সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন

করিতে লাগিল, রণক্ষেত্র শবে পরিপূর্ণ হইল। দুরাণী সেনারা পলাতক সেনাগণকে ১০ ক্রোশ পর্য্যন্ত কাটিতে২ চলিল, সেনাগণ যাহাদিগকে কাটিতে না পারিল গ্রামস্থ কৃষিগণ তাহাদিগকে সংহার করিল। এই প্রকার প্রায় দুই লক্ষ মনুষ্য নষ্ট হইল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ও বিশ্বনাথ রাও ঐ সঙ্গে হত হইলেন, আর ২ প্রধানেরা কেহ হত কেহ আহত হইলেন।

এই দুর্ঘটনা-সংবাদে পেশওয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, ঐ চিন্তায় কালরোগ উপস্থিত হইল, তাহাতে তিনি অল্প কালের মধ্যে কালগ্রাসে পড়িলেন। তদনন্তর মহারাষ্ট্রীয় প্রধানদিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ জন্মিল, সুতরাং তাহাদের বল হ্রাস হইতে লাগিল, তাহাতে অনেক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় ধুম ধাম রহিল না।

আহম্মদ সাহ জয়প্রাপ্ত হইয়া একেবারে দিল্লী নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় কিয়ৎ কাল অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বদেশে গমন করিলেন। তাহার পর তিনি ভারতবর্ষে আর আইসেন নাই। কিন্তু এই রাজ্যে আর এক নূতন কাণ্ড উপস্থিত হইল। যে ইংরাজেরা এই ক্ষণে এই রাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন তাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া ক্রমে ২ বঙ্গদেশে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লীশ্বরকে হীন দেখিয়া এই রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ইহার বিবরণ ভবিষ্যৎ গ্রন্থে লেখা যাইবে।

সম্পূর্ণ।